পরাজয়ের বিচার করিতেছেন। অন্তরীক্ষে দেব, ঋষি ও পিতৃলোক অধিষ্ঠান করিয়া ভীম দুর্য্যোধনের ভীষণ দ্বন্দ্ব যুদ্ধ সন্দর্শন করিতেছেন! এই সেই মল্লদেশ দ্বৈপায়ন হ্রদ! এক্ষণে ইহা কেবল নামেই পর্য্যবসিত হইয়াছে!! ইহার আয়তন প্রায় অর্দ্ধ বর্গ ক্রোশ হইবে। পূর্ব্বে চারিদিকই "গজগিরি" করা বাঁধান ছিল; অধুনা কেবল দুই দিকে ও স্থানে স্থানে সোপানাবলী বিদ্যমান আছে। সংস্কারাভাবে অবশিষ্ট অংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। এ সময়ে (শ্রাবণ মাসের প্রাক্কালে) সমস্ত হ্রদই প্রায় শুষ্ক, কেবল একধারে সামান্য পঙ্কিল জল আছে মাত্র, তাহাও শ্বেত শতদল দলে এরূপ পরিব্যাপ্ত যে অতি কষ্টে সঙ্কুচিত হইয়া স্নান করিতে হয়। একে জলের অল্পতা ও পঙ্কজদামের নিবিড়তা, তাহার উপর আবার কচ্ছপের বিলক্ষণ উপদ্রব আছে। কয়েকজন যাত্রী পক্ষি-স্নানের ন্যায় সেই কদর্য্য অল্প জলে স্নান করিতেছিল, কিন্তু আমাদিগের তাহাতে প্রবৃত্তি হইল না। হ্রদের উপর দিয়া অনতিবিস্তৃত একটী সেতু প্রস্তুত আছে। জনশ্রুতি—সেতুটী পাণ্ডবদিগের নির্ম্মিত হ্রদের অপর পার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অধুনা অল্প অংশ মাত্রেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এইটুকুই বোধ হয় নিয়মিত সংস্কার করা হয়। ইহা হ্রদমধ্যস্থিত লক্ষ্মী নারায়ণের মন্দিরের সহিত সংযুক্ত। ঘাটের উপরেই দেবালয়। এখানে পঞ্চ পাণ্ডবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুদিগের সকল তীর্থ স্থানই মুসলমানেরা অপবিত্র করিয়াছে, সুতরাং এখানেও যে তাহাদিগের উপদ্রব চিহ্ন দৃষ্ট হইবে না, এরূপ কখনই হইতে পারে না। উল্লিখিত পাণ্ডব সেতুর অনতিদূরেই একটী অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত সেতু সম্রাট্ অরেঞ্জীব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা যখন নির্ম্মিত হইয়াছিল, তখনও বোধ হয় হ্রদ সম্পূর্ণ জলপূর্ণ ছিল না, কারণ ইহাও পরপার পর্য্যন্ত বিস্তৃত নহে। অপর পারে সিদ্ধবটী। জনশ্রুতি দুর্য্যোধন এই স্থানে লুক্কায়িত ছিলেন। এখানে একটী প্রকাণ্ড বট বৃক্ষ আছে। ইহার সন্নিকটে হ্রদের অব্যবহিত উপরেই সমুচ্চস্থলে একটী বৌদ্ধ মঠ। মঠের অভ্যন্তরে ২টী পাদচিহ্ন ও একটী বেদিকা। স্থানটী অতীব মনোহর। ইহারই আবরণ প্রাচীরের মধ্যে এক দেশে কয়েকটী সোপান দৃষ্ট হয়। পাণ্ডারা অজ্ঞ যাত্রীদিগকে তন্নিম্ন স্থানে দুর্য্যোধনের লুক্কায়িত বাস নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন রৌদ্রে একারোহণে দুটী প্রদক্ষিণ করিলাম। পূর্ব্বে ইহা একটী মহাসমৃদ্ধিশালী তীর্থ ছিল, তাহা প্রদক্ষিণ করিলেই বিলক্ষণ অনুমিত হইয়া থাকে। এক্ষণে হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্যের সহিত এস্থানেরও প্রাদুর্ভাব অনেক কমিয়াছে। কুরুক্ষেত্র দানস্থলী। দ্বৈপায়নহ্রদ সম্বলিত ৮ ক্রোশ স্থান দানবেদী পুণ্যস্থলী। হিন্দুধর্ম্মমতে এখানে দান করিলে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয়

হইয়া থাকে। হরিদ্বারে বা হরদ্বারে স্নান, কুরুক্ষেত্রে দান, ও কাশীধামে বাস ইহাই পুণ্যকীর্ত্তি ও ধর্ম্মার্থী হিন্দুদিগের জীবনের লক্ষ্য।

এখান হইতে স্থানেশ্বর প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। স্থানেশ্বরেই প্রসিদ্ধ রামহ্রদ বা ব্রহ্মসর। কুরুক্ষেত্রে ব্রহ্মসর সত্য যুগের তীর্থ, সুতরাং ইহার মাহাত্ম্য পুরাণে বিশেষ বর্ণিত আছে। ইহার পৌরাণিক আয়তন কিরূপ তাহা জানিবার উপায় নাই; কিন্তু অধুনা ইহা একটী সামান্য কুণ্ড মাত্র। চারিধার গজগিরি বা প্রস্তরের সোপানে বান্ধান। স্ত্রীলোক ও পুরুষদিগের স্নানের জন্য পৃথক্ পৃথক্ স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। চারিদিকে ৪টী বৃহৎ বটবৃক্ষ ও ৪টি অশ্বত্থ বৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত থাকাতে স্থানটী ছায়াময় ও মনোহর হইয়াছে। কুণ্ডের অব্যবহিত পরেই স্থানেশ্বরের পবিত্র মন্দির। কুণ্ডের জল অপরিষ্কার, তবে দ্বৈপায়নহ্রদের ন্যায় পঙ্কিল ও কদর্য্য নহে। এখানেও কচ্ছপের সমধিক প্রাদুর্ভাব। পবিত্র রামহ্রদে স্নান করিয়া স্থানেশ্বরের মহাদেব সন্দর্শন করিলাম। অসময় নিবন্ধন যাত্রীর ভিড় ছিল না, সুতরাং দর্শনাদি অনায়াসেই সম্পন্ন হইল। শুনিলাম গত কুম্ভযোগে এখানে প্রায় তিন লক্ষ যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। তখন যে ইহা কিরূপ বিসদৃশ স্থান হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

মায়ের নিকট বালিকার রামায়ণ শ্রবণ।

বিধুমুখে সুধা হাসি, মায়ের সমীপে আসি
মৃদু মধু কহিছে বালিকা;
কহ মাতঃ, কৃপা করি, শুনিব শ্রবণ ভরি,
রামের বিচিত্র আখ্যায়িকা।
বলি, আকর্ণন আশে, বসিলা জননী পাশে
মেনকা সকাশে উমা যথা;
তনয়ার প্রীতি তরে, মাতা অতি সমাদরে
আরম্ভিলা পৌরাণিকী কথা।
শুন বাছা, সুললিত, শ্রীরাম মঙ্গলগীত
বাল্মীকির পুরাণ-সম্মত;
যেই রূপে রঘুরাজ, লীলা কৈলা বিশ্বমাঝ,
বিবরি কহিব সংক্ষেপত।
বীরত্ব ধীরত্ব ধাম, ছিলা দশরথ নাম
সার্ব্বভৌম রাজা অযোধ্যায়;
ক্রমে নৃপ মহাশয়, কৈলা তিন পরিণয়—
কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রায়।
চারি পুত্র জন্মে তাঁর, শ্রীরাম ভরত আর
লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন অভিধান;
রূপে সবে শশিসম, তেজঃ পুঞ্জে সূর্য্যোপম,
প্রভাবেতে দেবেন্দ্র সমান।
জনক, মিথিলাপতি, কন্যা তাঁর গুণবতী,
রূপে, সীতা সৌদামিনী নিভা;
স্বয়ম্বর স্থলে গিয়া, বাহুবল প্রকাশিয়া
শ্রীরাম করিলা তারে বিভা।
যুবরাজ বধূসনে, আসিলেন নিকেতনে,
রাজা চা'ন রাজ্য তাঁরে দিতে;
বিমাতা কৈকেয়ী বাম, বনবাসে গেল রাম,
সীতা আর লক্ষ্মণ সহিতে।

হ'লে ভগ্ন মনোরথ, পুত্র-শোকে দশরথ,
পরাণ করিলা পরিহার ;
রামের পাদুকা নিয়া, রাজাসনে প্রতিষ্ঠিয়া
ভরত লইলা রাজ্য ভা'র।
জানকী লক্ষ্মণ সনে, শ্রীরাম দণ্ডকারণ্যে
রহেন খাইয়া বনফল ;
শ্রীঅঙ্গ বাকলে ঢাকা, রাহুগ্রস্ত যেন রাকা,
নাহি শয্যা বিনা ধরাতল।
দৈব দোষে বিড়ম্বন, কোথা রাজ্য, কোথা বন,
তবু দুঃখ নহে অবসান ;
দশানন লঙ্কাপতি, ছল করি দুষ্টমতি,
সীতা হরি করিল প্রয়াণ।
হনুমান, নীল, নল, সুগ্রীবাদি মহাবল,
কপিগণে করিয়া সহায়,
সীতার উদ্ধার হেতু, সাগরে বাঁধিয়া সেতু,
দাশরথি পশিলা লঙ্কায়।
রাম-প্রেমে মুগ্ধমন, যোগ দিল বিভীষণ
রাবণের কনিষ্ঠ সোদর ;
রাক্ষসে, বানরে নরে, শিলা, যষ্টি, মুষ্টি, শরে
বাঁধিল সমর ঘোরতর।
কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিত, রক্ষঃ সেনা অগণিত,
একে একে পাইল নিধন ;
মজিল রাক্ষস জাতি, লঙ্কাপুরে দিতে বাতি
বুঝি না রহিল একজন।
ক্রোধে জ্বলি দশানন, করিলা দুর্জয় রণ,
শক্তিশেলে লক্ষ্মণে বিঁধিলা ;
বৈদ্যের ব্যবস্থা জানি, বিশল্যকরণী আনি,
হনুমান তাঁরে বাঁচাইলা।
তবে রাম ক্রোধ ভরে, বধিলেন লঙ্কেশ্বরে
ব্রহ্ম অস্ত্র করিয়া সন্ধান ;
ত্রিলোকে ঘুচিল শঙ্কা, সাদরে সোণার লঙ্কা
বিভীষণে করিলা প্রদান।

জানকী লক্ষ্মণ সাথ, সমারোহে রঘুনাথ
উত্তরিলা অযোধ্যা নগরে ;
ভরত প্রফুল্লমন, পিতৃত্যক্ত রাজ্য ধন
সমর্পিলা অগ্রজের করে।
বেষ্টিত স্বজনগণে, সীতা সহ সিংহাসনে
রাজা হয়ে বসিলেন রাম ;
মেঘেতে বিজলী ছটা, হেরি সে সুষমা ঘটা
কৌশল্যার পূর্ণ মনস্কাম।
কাল ক্রমে সীতা সতী, পঞ্চমাস গর্ভবতী;
পুনঃ সাধ্বী পড়ে দৈব রোষে ;
দশানন দুরাচার, ছিল সীতা গৃহে তার,
দুষ্ট লোকে অপযশ ঘোষে।
প্রজা তুষ্টি হেতু রাম, বনিতারে হয়ে বাম,
বিনা দোষে বর্জিলা তাহারে ;
বাল্মীকির তপোবনে, মুনি-কন্যাগণ সনে
রহে সীতা ব্রত সদাচারে।
করে সতী সুপ্রসব, শুভলগ্নে কুশ লব
নামে দুই যমজ নন্দন ;
রূপে, তেজে, প্রতিভায়, ক্রমে দোঁহে বৃদ্ধি পায়,
শুক্লপক্ষে সুধাংশু যেমন।
অযোধ্যায় রঘুমণি, পুত্র সম মনে গণি
প্রজায় পালেন মহাভাগ ;
সীতা যেই নির্ব্বাসিতা, নির্ম্মাইয়া স্বর্ণ সীতা
আরম্ভিলা অশ্বমেধ যাগ।
যজ্ঞ দেখিবার মনে, মহর্ষি বাল্মীকি সনে
কুশ লব করে আগমন ;
মুনির ইঙ্গিত পেয়ে, রাজসভা স্থলে গিয়ে,
রামেরে শুনায় রামায়ণ।
পুত্রকৃত পরিচয়ে, সীতা আনি নিজালয়ে
পরীক্ষা করিতে রাম চান ;

জানকী শুনি সে কথা, অন্তরে পাইয়া ব্যথা
অভিমানে ত্যজিলা পরাণ।
কাঁদে ক্রোড়ে কুশ লব, কাঁদে পুরনারী সব,
মুগ্ধ রাম বনিতার শোকে;
এইরূপে লীলা করি, জীবলোক পরিহরি
চারিভ্রাতা গেলা সুরলোকে।
ভারতে অক্ষয় ধন, ধন্য গ্রন্থ রামায়ণ,
বাল্মীকি বচন সুধারস।
ধন্য রঘুমণি রাম, হেরি যাঁর গুণগ্রাম
বনের বানর হৈল বশ।
স্নেহভক্তি অবতার ধন্য ভ্রাতৃগণ তাঁর,
ধন্যা সীতা সতীকুলেশ্বরী;
যত্নে কর বাছাধন, নীতি রত্ন আহরণ,
এঁদের চরিত পাঠ করি। *

বানরের প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব।

অনেকেই জানেন, বানরেরা সময়ে সময়ে মনুষ্যের ন্যায় কার্য্য করিয়া মানবদিগকে চমৎকৃত করে। অল্প দিন অতীত হইল, আমরা একটী বানরের অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। ঘটনাটী যথাযথ বর্ণন করি, পাঠক পাঠিকাগণ দেখুন বানরজাতি কিরূপ প্রতিভাশালী।

একজন পথিক হাতে একটী বদ্ধমুখ হাঁড়ি ঝুলাইয়া লইয়া যাইতেছিল। পথিকের বেশ সাপুড়েদিগের ন্যায়। হাঁড়ির মুখে একখানি সরা, গলায় দড়ি দিয়া বাঁধা, পথিক সেই দড়িতে হাঁড়ীটী ঝুলাইয়া লইয়া যাইতেছিল। মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্য্যকিরণে তাহার শরীর অবসন্ন হওয়ায় পথপার্শ্বস্থ একটী বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে হাঁড়ীটী রাখিয়া বিশ্রামার্থ উপবেশন করিল। একে ছায়াচ্ছন্ন বৃক্ষতল সুশীতল, তাহাতে আবার সেখানে শীতল বায়ুর সঞ্চার, শ্রান্তিসুলভ নিদ্রা পথিককে আক্রমণ করিলে পথিক বৃক্ষে ঠেশ দিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য অচেতনপ্রায় হইল। এই গাছে কতকগুলি বানর ছিল, ঐ অবসরে তাহারা সমবেত হইয়া যেন কি বলাবলি করিল। অল্পক্ষণ পরে একটা বানর আস্তে আস্তে নামিয়া

---

* পাঠক পাঠিকাগণের নিকট প্রশংসা লাভের প্রত্যাশায় প্রণোদিত হইয়া লেখক এই প্রবন্ধ প্রণয়ন করেন নাই। কারণ এই মহা পৌরাণিকী কথায় নূতনত্বের অবতারণা তাঁহার ন্যায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তির দুঃসাধ্য। তবে তাঁহার যাহা উদ্দেশ্য তাহা এই:—অস্মদ্দেশে, পুত্র কন্যাগণ উপাখ্যান শুনিতে চাহিলে রমণীদের কাহিনী (বা উপকথা) বলিয়া থাকেন। তাহাতে অনেক সময় উপকার না হইয়া বরং ভূত, প্রেত, রাক্ষস প্রভৃতির অলীক কুসংস্কার তাহাদের তরল হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়। তাই লেখকের প্রার্থনা স্ব স্ব সন্তানগণ উপাখ্যান শ্রবণ করিতে চাহিলে, বিদুষী পাঠিকাগণ রাজপুত্র মন্ত্রিপুত্র, কোটালপুত্র ও সদাগরপুত্র এবং রাক্ষস ও রাজকন্যা প্রভৃতির অলীক গল্প না করিয়া রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী প্রভৃতির পৌরাণিকী কথা দ্বারা তাহাদিগের কৌতূহল নিবারণ করেন। এই প্রবন্ধ তাহারই একটী দৃষ্টান্ত মাত্র। সঃ।

আসিয়া চট্ করিয়া পথিকের হাঁড়ীটী লইয়া দ্রুতপদসঞ্চারে গাছের উপরিভাগের একটা অগ্র ডালে গিয়া বসিল। সাহসিপ্রধান বানর হাঁড়ি আনিতে পারিয়াছে দেখিয়া অন্যান্য বানরের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না, সকলে সমবেত হইয়া নানা প্রকার আনন্দধ্বনি প্রকাশ করিতে লাগিল।

হাঁড়ী আনয়নকারী বানর হাঁড়ীর মধ্যে না জানি কি উত্তম খাদ্য আছে ভাবিয়া আনন্দোৎফুল্ললোচনে যেমন হাঁড়ীর মুখাবরণ সরাখানি এক হস্তে উত্তোলন করিল, অমনি তন্মধ্য হইতে একটী সাপ গর্জ্জিয়া উঠিল এবং ফণা বিস্তার করিয়া হাঁড়ির উপরে ও বানরের অভিমুখে অর্দ্ধাঙ্গ দোলায়িত করিতে লাগিল। ভাগ্যের বিষয় এই যে ফণী সহসা বানরকে দংশন করিল না, কেবল দুলিতেই থাকিল। এই ঘটনায় বানর যাহা করিল,তাহা অতি অদ্ভুত। ভাবিতে গেলে বানরবুদ্ধিকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। কোন মনুষ্য সেরূপ বিপন্নকালে সেরূপ প্রত্যুৎপন্নমতি দেখাইতে পারে কি না সন্দেহ, সন্দেহ কেন, পারে না বলিয়াই বিশ্বাস।

যেমন হাঁড়ির মুখ খোলা, তেমনি সাপ বাহির হওন, তেমনি বানরের যোগাবলম্বন। বানর হাঁড়ির গলবন্ধন রজ্জু—পথিক যাহা ধরিয়া ঝুলাইয়া আনিয়াছিল সেই রজ্জু—নিজ গলদেশে দিয়া হাঁড়ি ঝুলাইয়া দিয়াছিল, পরে সরার মুখ খুলিয়াছিল। বানর আসন্ন বিপদে ধৈর্য্যভ্রষ্ট ও বুদ্ধিভ্রষ্ট না হইয়া যোগীর ন্যায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কাষ্ঠের মত নিস্পন্দ ভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, সাপ হাঁড়ির উপরে অর্দ্ধাঙ্গ উত্তোলিত ও ফণা বিস্তার করতঃ কেবল এদিক্ ওদিক্ ঝুঁকিতে লাগিল। বানরের সেই বুদ্ধিকৌশল ও অবস্থানভঙ্গী দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। এদিকে অন্যান্য বানরেরা ব্যস্ত ত্রস্ত হইয়া এ ডাল ও ডাল করিতে লাগিল এবং নানা প্রকার শব্দ ও হস্ত পদাদির আন্দোলন করিতে লাগিল। তাহাদের সেই সেই ভঙ্গিমা দেখিয়া আমরা স্পষ্টই বুঝিলাম, বানরেরা যেন সেই বিপন্ন বানরের জন্য ত্রস্ত হইয়াছে এবং উপদেশ করিতেছে বা বলিয়া দিতেছে—ওটাকে ধরিয়া ছিঁড়িয়া ফেল—নখে বিদীর্ণ কর। কিন্তু বিপন্ন বানর যোগাসনে নিশ্চল নিস্পন্দ। বানরজাতি যে তত চঞ্চল; তথাপি সে সেই উপস্থিত বিপদে কাষ্ঠের ন্যায় নিশ্চল ও নিস্পন্দ। মধ্যে মধ্যে দু একবার কোটরপ্রবিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু যেন মিট্ মিট্ করিতেছে।

ঐরূপে প্রায় ১০ মিনিট অতিবাহিত হইল। অন্যূন ১০ মিনিট পরে সাপ পলাইবার অভিপ্রায়ে বার কতক এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া নিকটস্থ এক পত্রবাকীর্ণ ক্ষুদ্রডাল লক্ষ্য করিয়া মস্তক অবনত করিল এবং সেই সময় তাহার ফণাও সংকুচিত হইয়া গেল। আশ্চর্য্য এই যে, সাপ যেই মাথা নোয়াইয়াছে,সতর্ক বানর সেই

পুত্রে তাহার গলদেশ এক হস্তে খুব জোরের সহিত ধরিয়া অন্য হস্তে গলার ঝুলান দড়ি ছাড়াইয়া সজোরে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক অন্য এক শাখায় গিয়া বসিল। দেখিলাম সাপ ধরা পড়িয়াছে, দেখিয়া সমুদায় বানর আনন্দ নিনাদ করিতে লাগিল। এখন কোন বানর আসিয়া সাপের লেজ ধরিল, কেহ তাহার গাত্রে নখ প্রবেশ করাইল, যে গলা চাপিয়া ধরিয়াছে সে খুব জোরে সাপের মুখ ডালে ঘষিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে সাপ মরিয়া গেল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া গেল। বানরেরা তখন তাহাকে বৃক্ষতলে নিক্ষেপ করিয়া বৃক্ষের অগ্রভাগে গিয়া উপবেশন করিল।

এই অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছিলাম এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিস্ময়পূর্ণ মনে বানরের বুদ্ধির প্রশংসা করিয়াছিলাম। সাপুড়ে সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া অতীব বিস্মিত হইল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল।

বানরজাতি যে অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন তাহা পূর্ব্ব হইতে শুনা ছিল, সম্প্রতি এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া সে কথা অধিক সত্য বলিয়া স্থির হইল। ধন্য জগদীশ্বর! তোমার সৃষ্টিকৌশল কে বুঝিতে পারে!

প্রসঙ্গক্রমে আর একটী বানরের বুদ্ধিমত্তার পুরাতন কথা স্মরণ হইল, বর্ণন করিতেছি।

যাহারা বানর খেলাইয়া বেড়ায়, তাহাদিগের অবস্থা সকলেই জানেন। নাচের বানরকে তাহারা পোষাক পরায়, পোষাকপরা বানর তাহার প্রভুর অনুসারে নানাপ্রকার ক্রীড়া করে। ইহারা কেবল বানর নাচায় এমন নহে, দুই তিনটী করিয়া রামছাগলও ইহাদের সঙ্গে থাকে। বানর সেই রামছাগলের পৃষ্ঠে সোয়ার হয় ও তাহার সহিত অনেক প্রকার কৌতুক করিয়া দর্শকদিগকে তৃপ্ত করে।

একদিন কাল্‌নার ঘাটে এক বানরনাচক বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় স্নানাহার করিবার জন্য উপস্থিত হইল। সে আহার করিবে বলিয়া বাজার হইতে দধি ও চিড়া ক্রয় করিয়া আনিয়াছিল। বানর ছাগল ও সেই খাদ্য উপরে রাখিয়া সে গঙ্গায় স্নান করিতে গেলে পর অবসর পাইয়া দুষ্ট বানর প্রভুর আনীত সেই দধি তাড়াতাড়ি ভক্ষণ করিল এবং দধির কিয়দংশ ছাগলের মুখে মাখাইয়া দিয়া এক পার্শ্বে গিয়া ভাল মানুষের মত (যেন কিছুই জানে না) চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বানরনাচক স্নান করিয়া আসিয়া দেখিল, সে দধি নাই এবং ছাগলের মুখে দৈ মাখা। তাহা দেখিয়া তাহার নিশ্চয় বোধ হইল, ছাগল তাহার দধি খাইয়াছে, অবশেষে সে ক্রোধে অধীর হইয়া ছাগলকে প্রহার করিতে লাগিল। এই ব্যাপার দেখিয়া অনেক লোক সেখানে জমিয়া গেল, এবং আশ্চর্য্য এই যে, তন্মধ্যস্থ একজন বানরের সেই দুষ্কাতি

প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, সে তাহা বানর-নাচককে বলিতে উদ্যত হইলে বানর তাহার মুখপানে চাহিয়া অতীব কাতরতা-ব্যঞ্জক মুখবিকৃতি করিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে বানরও যথোচিত প্রহার প্রাপ্ত হইল, কিন্তু দর্শক ও বানরনাচক তাহার বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না। বানর জাতির বুদ্ধি সম্বন্ধে যে সকল অদ্ভুত কাহিনী শুনা যায়, আমাদের বিবেচনায় সে সকল নিতান্ত অসত্য নহে। আরও কত ইতর প্রাণীর বুদ্ধিচাতুর্য্যের কত পরিচয় পাওয়া যায়।

নূতন সংবাদ।

১। কলিকাতার লোক সংখ্যা ১৮৮১ সালে ৪৩৩২১৯ ছিল, ১৮৯১ সালের গণনায় ৬৮১৫৬০ হইয়াছে।

২। গত ৯ই ফেব্রুয়ারি পার্লেমেণ্ট মহাসভা খুলিয়াছে। মহারাণীর বক্তৃতায় তাঁহার পৌত্রের শোকে তাঁহার সুবিশাল রাজ্যের প্রজাগণ যে সহানুভূতি করিয়াছেন, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইয়াছে, ভারতের জন্য নূতন প্রণালীতে ব্যবস্থাপক সভা গঠনের উল্লেখ আছে।

৩। প্রিন্স বিক্টরের মৃত্যুতে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রিন্স জর্জ ব্রিটিষ সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী। ইহাঁর সহিত আবার দুর্ভাগিনী রাজকুমারী মেরী টেকের বিবাহের কথা হইতেছে।

৪। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলবাসী-দিগের উন্নতি কল্পে ভিজার রাজা ১০৲ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

৫। পণ্ডিত অযোধ্যানাথের স্মরণার্থ সভা কলিকাতার টাউন হলে আহূত হয়, দ্বারভাঙ্গার মহারাজা তাহার সভাপতির কার্য্য করেন।

পুস্তকাদিসমালোচনা।

১। নবীনা জননী—শ্রীপ্রমথ নাথ চট্টোপাধ্যায়, এম্ এ, প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। এ এক খানি নূতন ধরণের সামাজিক উপন্যাস। মানব চরিত্রের সুখ দুঃখ আশা নিরাশার গূঢ় মর্ম্ম বুঝিয়া, সুন্দর ও সুললিত ভাষায় তাহা অঙ্কিত করিয়া উঠা সকল লেখকের শক্তিতে কুলায় না। এই জন্যই সাধারণ গল্পের বই গুলি উপন্যাস নামে পরিচিত হইয়া উপন্যাসের পশার মাটি করিয়া দিয়া থাকে। যাঁহারা গভীররূপে মানব-চরিত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, মনুষ্য চরিত্র পশুপ্রকৃতি, মনুষ্যত্ব ও দেবভাবের আশ্চর্য্য সমাবেশ মাত্র। যে মানুষ এক সময়ে রিপুর গোলাম হইয়া সমাজের কত অমঙ্গল ঘটায়, পাপের ভীষণ মূর্ত্তি দেখাইয়া সমাজের কত আতঙ্ক উপস্থিত করে, সেই মানুষ আবার যখন দেবভাবের বশীভূত হইয়া কার্য্য করে, তখন বহু

কালের সামাজিক ব্যাধি দূরীভূত হয়, সমাজ এক নূতন শ্রী ধারণ করে, মানুষ সাধারণের সম্মুখে এক নূতন আদর্শ আনিয়া মনোহর বেশে অবতীর্ণ হয়। নবীনা জননী-লেখক মানব প্রকৃতির অতি গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া তাহার পরস্পর বিরোধী অসংখ্য ভাব, অসংখ্য আকাঙ্ক্ষা, অসংখ্য বাসনা অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং অতি সুনিপুণ চিত্রকরের ন্যায় উজ্জ্বলরূপে সে গুলি চিত্রিত করিয়াছেন, বৃদ্ধ হরি দয়াল বাবুর চরিত্র যেমন, প্রায় সকল চরিত্রই সেইরূপ গ্রন্থকার উত্তম রূপে ফুটাইয়াছেন। ললিত ও প্রতিভাকে তিনি মনুষ্যত্বের সীমাতেই আবদ্ধ রাখিয়াছেন। কিন্তু হেমন্তকুমার ও নবীনা জননী উষার জীবনে নির্ম্মল ও নিষ্কাম দেবভাবের অপূর্ব্ব জ্যোতি ফলাইয়া তাঁহাদের দ্বারা আদর্শ গৃহস্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। হাস্যোদ্দীপনের ক্ষমতা গ্রন্থকারের বেশ আছে। গ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে ইচ্ছাসত্ত্বেও কতবার হাস্যসংবরণ করা অসম্ভব হইয়াছে। দুই এক স্থানে চক্ষের জলও সংবরণ করা যায় নাই। এরূপ গ্রন্থের যত আদর হয়, ততই সমাজের কল্যাণ।

২। তারা ব্রহ্মময়ী মা বা মাতৃপদাঞ্জলি স্তোত্র—শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন প্রণীত। ২৪টী সংস্কৃত কবিতাস্তবকে এই পুস্তিকাখানি গ্রথিত এবং তাহাতে মাতৃভাবে ঈশ্বরের স্তব করা হইয়াছে। বাঙ্গালা কবিতায় প্রত্যেক স্তোত্রের অনুবাদ আছে। কবিতাগুলি যেমন সুন্দর সুললিত, সেই রূপ প্রগাঢ় ভক্তিরসাত্মক ও হৃদয়স্পর্শী। ধর্ম্মপিপাসু নরনারীর পক্ষে পুস্তকখানি অতি উপাদেয় হইবে, সন্দেহ নাই। মুদ্রাঙ্কণ যারপর নাই সুন্দর হইয়াছে।

৩। রঘুবংশ ১ম ভাগ শ্রীনবীনচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক বাঙ্গালা কবিতায় অনুবাদিত। মহাকবি কালিদাসের এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ বাঙ্গালা কবিতার পরিচ্ছদে সুসজ্জিত করিয়া প্রচার করা সহজসাধ্য নহে। নবীন বাবু এ বিষয়ে যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ক্ষমতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। গ্রন্থ খানি সুপাঠ্য হইয়াছে, ইহা সম্পূর্ণাকারে প্রকাশিত দেখিবার প্রতীক্ষায় রহিলাম।

বামারচনা।

প্রিয়বালা।

আয় তো আমার প্রিয়বালা,
আয় তো আমার হৃদয় বাসিনি,
বল্ তো কথা সুধার ভাষে,
তোল তো ও চাঁদ বদনখানি।

চাইলে তোমার মুখের পানে,
দেখ্‌লে তোমারি মধুর হাসি,
আমি কি আর আমায় থাকি,
প্রাণ চলে যায় কোথায় ভাসি!

যে আলোকে, সোনালী চাঁদ
নিত্য হাসে শ্যামল সাঁঝে।'
যে আলোকের ছড়া ছড়ি
বেলি যূথি গোলাপ মাঝে,
যে আলোক, উষার বাহার,
যে আলোকের তরুণ রবি,
যে আলোকে, ভুবন খানি
মনে হয় "কি সোণার ছবি!"
সেই আলোকে কেমন যেন
তোর মু'খানি সদাই মাখা,
দেখ্‌তে দেখ্‌তে হলেম সারা
তবু দেখ্‌লে যায় না থাকা।
মনটা যেন শিউরে ওঠে,
প্রাণটা যেন বেরোয় কেঁপে,
তাইতে তোরে এম্‌নি ক'রে
বুকের প'রে ধরি চেপে।
তোমার মুখে তোমার বুকে
স্বরগ দেশের ভালবাসা,
তোমার কথা, তোমার গাথা,
সব্ গুলো স্বরগের ভাষা!
স্বরগ পুরের ফুল্‌টী তুমি
ভূলোক মাঝে দ্যুলোক মেয়ে,
মানুষ গুলো "অমর" হয়
তোমার গায়ের গন্ধ পেয়ে।
তোমায় দেখে বিশ্ব গলে
ব'য়ে যায় কি প্রেমের ঢেউ,
থাকে না ক' ঝগড়া ঝাটি
"পর্" থাকে না একটী কেউ।—
তাও ছাড়া আর্ কিছু আছে
তোমার মুখে মাখা মাখি,
তোরেই দেখ্‌লে মনে পড়ে—
*   *   *   *
! থা'ক্ থা'ক্ থা'ক্ থা'ক, তা বাকি।

*   *   *   *
তখন আমার জগৎ খানি
শুধুই কেবল ব্রহ্মময়,
তখন আমার শব্দ গুলা
যেন বেদান্তের কথা কয়।
"স্বরগ আছে দেবতা আছে"
তখন আমি বুঝ্‌তে জানি,
মরণ প'রে জীবন আছে—
চোখে দেখার মতন মানি।
পুরাণ, কোরাণ, বাইবেলি-জ্ঞান,
ঐ মুখে মোর সবই লেখা,
মনুষ্যত্ব, বিশ্বতত্ত্ব,
তোমার কাছেই আমার শেখা।
এ শুকনো নীরস প্রাণে
তোমার তরেই তুফান ছোটে,
তোমার তরে এ সাহারায়
দু'চার্ হাজার কুসুম ফোটে।
যাবার বেলা, প্রাণটী আমার
তো'তে রেখেই চলে যাব,
আমার যা'সব রইল বাকি
তুমি পেলেই আমি পাব।
যে দিন তুমি এসেছিলে
সেদিন ছিল পীযুষ ঢালা,
তাই আমরা, তোমার নাম
রেখেছিলেম "প্রিয়-বালা"।
আজ—
গরীব আমি কাঙাল আমি
কোথায় বা কি পাব আর—
এইটী নিও, বলে তোমার
"জনম দিনের উপহার"!

শ্রী প্রিয়-প্রসঙ্গ রচয়িত্রী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩২৬ সংখ্যা। } ফাল্গুন ১২৯৮—মার্চ্চ ১৮৯২। { ৪র্থ কল্প। ৫ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বাবু ব্রজমোহন দত্তের পারিতোষিক বিভ্রাট—১৮৮৯-৯০ এবং ৯০-৯১ এই দুই বৎসরের পারিতোষিক প্রদত্ত হইতে পারে নাই,: ইহার কারণস্থলে উল্লেখ করা হইয়াছে, 'যথেষ্ট গুণবিশিষ্ট কোন রচনা বিচারকদিগের নিকট প্রেরিত হয় নাই।' এই জন্য ৯১-৯২ সালে "বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের শিল্পবিদ্যা" বিষয়ে রচনা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে এবং এবার ৩টী পারিতোষিক একসঙ্গে বিতরিত হইবে। তেমন গুণের রচনা না মিলিলে অবশ্য আগামী বারের জন্য ৪টী পারিতোষিক জমিবে এবং ক্রমে অধিক জমিতে পারে। বিচারকেরা কি দেখিয়া গুণের বিচার করেন, আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু "বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের বর্ত্তমান অবস্থা" বিষয়ক রচনাটী পরিত্যক্তের মধ্যে একটী, তাহা বামাবোধিনীতে (গত জ্যৈষ্ঠ হইতে কয়েক সংখ্যায়) প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নিগুর্ণ কি না সাধারণে বিচার করিতে পারেন। এরূপ চিন্তা, অভিজ্ঞতা ও সুবিচার পূর্ণ রচনা বিচারকদিগের মনোনীত না হইলে কিরূপ রচনা হইবে আমরা জানি না। আর এক কথা একবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা লেখার জন্য যিনি পুরস্কৃত হইয়াছেন তিনি আর কস্মিন্‌কালে পুরস্কার পাইবেন না, তাঁর ভাগ্যে রচনাটী আবার 'সর্ব্বোৎকৃষ্ট' বলিয়া গ্রাহ্য হইলে তাঁর নাম গেজেটের বিজ্ঞাপনে যাইবে, এ ব্যবস্থাটীও আমাদিগের নিকট সঙ্গত বোধ হইল না। হিন্দু গৃহের স্ত্রীলোক গেজেটে নাম ছাপা দেখিবার জন্য তত ব্যস্ত

নহেন। দাতার উদ্দেশ্য সাধনে ফণ্ডের ট্রষ্টীগণ অধিকতর মনোযোগী হন, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

জর্ম্মণিতে ধর্ম্মশিক্ষা— জর্ম্মণ সম্রাট সাম্রাজ্যের সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে ধর্ম্মশিক্ষায় বাধ্য করিয়াছেন। ভারতের অধিকাংশ স্কুল কলেজে ধর্ম্মশিক্ষার নাম গন্ধ নাই। অভিভাবকেরাও ধর্ম্মশিক্ষার অভাব অনুভব করেন না। ইহার ফলে বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজ কিস্তূত কিমাকার পদার্থ হইতেছেন।

স্ত্রীকর্ম্মচারী—বোম্বাই মিউনিসিপালিটী স্ত্রী কেরাণী নিয়োগের নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। স্ত্রীলোকগণ শিক্ষিত হইলে তাহাদের মূল্য ও আদর ক্রমে বাড়িবে সন্দেহ নাই।

লেডী ডফরীন হাঁসপাতাল— কলিকাতার হাঁসপাতালটী নূতন বড় রাস্তার ধারে সুন্দর ও প্রশস্তাকারে নির্ম্মিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের নিম্নলিখিত নগর সকলে আরও চারিটী স্ত্রী হাঁসপাতাল হইয়াছে:—ভাগলপুর, দ্বারভাঙ্গা, গয়া ও কটক।

কুচবিহারের মহারাণী—প্রায় ৩ মাস কাল উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। বড় বড় সাহেব ডাক্তারেরা তাঁহার জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, পরে সুবিখ্যাত ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন। ইহাঁর সুচিকিৎসায় জীবনের আশা হইয়াছে দেখিয়া আমরা পরম সুখী হইলাম। জগদীশ্বর মহারাণী সুনীতিকে নিরাময় করুন।

ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল—গত ২৬এ ফেব্রুয়ারী কাশীধামে ইহার বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছে। নির্দ্দিষ্টক ও বিশৃঙ্খল হিন্দুসমাজের মধ্যে সুশৃঙ্খলা ও সুশাসন আনয়ন করা এই সভার উদ্দেশ্য। সভা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্য হইলেও সুখের বিষয়।

বীরপুরুষের বীরত্বের সম্মান রক্ষা।

যখন মোগল সম্রাট্ আওরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া, চারিদিকে আপনার আধিপত্য বিস্তার করেন, তখন মহারাষ্ট্রে মহিমান্বিত শিবজী স্বাধীনতার সম্মান রক্ষায় উদ্যত হয়েন। তাঁহার যেমন অসাধারণ সাহস, সেইরূপ লোকাতীত অধ্যবসায় ছিল। তিনি সম্রাটের নিকটে কিছুতেই অবনত-মস্তক হইলেন না, দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, প্রতিদিনই সম্রাট্ তাঁহার অনুপম তেজস্বিতায় বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে লাগিলেন। তিনি এই পরাক্রান্ত বিপক্ষকে বশীভূত করিবার জন্য আপনার মাতুল শায়েস্তা খাঁকে দক্ষিণাপথের সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন। যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র শিবজীর ক্ষমতা খর্ব্ব

জয়, তাঁহার অধিকৃত জনপদ ও তাঁহার দুর্গসকল অধিকারভুক্ত হইয়া উঠে. তদ্বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ দিবার জন্য, এই নব-নিয়োজিত সুবাদারের উপর আদেশ হইল। সম্রাটের আদেশে শায়েস্তাখাঁ বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া আও-রঙ্গাবাদ হইতে পুনার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পুনা অধিকৃত হইল। শিবজী মোগল সৈন্যের আগমন সংবাদ পাইয়া, রায়গড় ছাড়িয়া, সিংহগড় নামক প্রসিদ্ধ দুর্গে অবস্থিতি করিতে লাগি-লেন। এদিকে শায়েস্তাখাঁ পুনা হস্তগত করিয়া, একদল পরাক্রান্ত সৈন্য ঘাট পর্ব্বতের পার্শ্ববর্ত্তী আর একটি স্থান অধিকার করিতে পাঠাইলেন। কিন্তু তেজস্বী সুবাদার বিনা বাধায় মহারাষ্ট্র-রাজ্যে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। শিবজীর মহামন্ত্রবলে মহারাষ্ট্রীয়গণ সাহস ও বলসম্পন্ন হইয়াছিল। স্বাধীনতার গৌরবে তাহাদের বীরত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছিল, জাতীয় জীবনে তাঁহাদের একতা সাধিত হইয়াছিল, আত্মসম্মানের মহিমায় তাহা-দের হৃদয়ে স্বদেশহিতৈষিতা প্রসারিত হইয়াছিল। মোগল সুবাদার সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও এই স্বাধীনতা-প্রিয় পরা-ক্রান্ত জাতির স্বাধীনতার সম্মাননাশে সমর্থ হইলেন না। মহারাষ্ট্রে চকন নামে একটি ক্ষুদ্র জনপদ ছিল। শিবজী ফিরঙ্গজী নামক একজন যুদ্ধবীরের হস্তে ঐ জনপদের রক্ষার ভার সমর্পণ করিয়া-ছিলেন। তেজস্বী ফিরঙ্গজী সত্তর বৎসর কাল মুসলমানের অধিকারের মধ্যে চক-নের স্বাধীনতা অক্ষত রাখিয়াছিলেন। শায়েস্তাখাঁ চকনের আয়তন অতি ক্ষুদ্র দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন, যে তিনি আদেশ করিবামাত্র ঐ সঙ্কীর্ণ নগরের শাসনকর্ত্তা তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিবেন। কিন্তু ফিরঙ্গজী ক্ষুদ্র জনপদের রক্ষক হইলেও ক্ষমতায় ও তেজস্বিতায় ক্ষুদ্র ছিলেন না। তিনি আত্মসমর্পণ করি-লেন না, আত্মস্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিলেন না। বীরপ্রবর অসামান্য বীরত্বের সহিত তেজস্বী মোগল সৈন্যের সম্মুখে আত্মরক্ষায় উদ্যত হইলেন। ক্রমে একমাস গেল, আর এক মাসেরও অর্দ্ধাংশ অতীত হইল, তথাপি মহাপরা-ক্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় মোগলের পদানত হইলেন না। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ অতিবাহিত হইতে লাগিল, প্রতিদিনে প্রতি সপ্তাহে ফিরঙ্গজী নবীন সাহস, নবীন উদ্যম, নবীন বীরত্বে প্রমত্ত হইয়া, স্বাধীনতার সম্মান রক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে একমাস পঁচিশ দিন অতীত হইল। চকন শায়েস্তাখাঁর অধিকৃত হইল না। ষড়-বিংশ দিনে হঠাৎ নগর প্রাচীরের এক দিকে একটি কুপ্যা ফুটিয়া উঠাতে প্রাচী-রের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গেল। আক্রমণ-কারী সৈন্য মহোল্লাসে ঐ ভগ্ন স্থান দিয়া, নগর-প্রবেশে উন্মুখ হইল।

এই সঙ্কটকালে সাহসী ফিরঙ্গজী আপনার সৈন্যের পুরোভাগে থাকিয়া

বিপক্ষের গতিরোধে উদ্যত হইলেন। তাঁহার পরাক্রম ও ক্ষমতা কিছুতেই পর্য্যুদস্ত হইল না। তিনি এমন কৌশল ও তেজস্বিতার সহিত বিপক্ষের আক্রমণে বাধা দিতে লাগিলেন যে, আক্রমণকারী সৈনিকদল কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিল না। ফিরঙ্গজী সমস্ত দিন এইরূপে আত্মরক্ষা করিলেন, সমস্ত দিন নগর প্রাচীরের ভগ্ন স্থানে দাঁড়াইয়া বহুসংখ্য সৈন্যের অধিনায়ক শায়েস্তা খাঁর সম্মুখে বুক পাতিয়া শিবজীর মহামন্ত্রের গৌরব অপ্রতিহত রাখিলেন। ক্রমে রাত্রি উপস্থিত হইল। অনন্ত নৈশ গগনে দুই একটি তারকা-স্তবক ধীরে ধীরে বিকাশ পাইতে লাগিল। রাত্রি সমাগমে মোগল সৈন্য যুদ্ধে নিরস্ত হইল। পরদিন প্রাতঃকালে তেজস্বী ফিরঙ্গজী শায়েস্তাখাঁর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। শায়েস্তাখাঁ এই বীরপুরুষের সমুচিত সম্মান করিতে ত্রুটি করিলেন না। তিনি ফিরঙ্গজীর অসাধারণ সাহস ও ক্ষমতার প্রশংসা করিয়া, তাঁহাকে যথোচিত পারিতোষিকের সহিত মোগল সরকারে চাকরী গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তেজস্বী ফিরঙ্গজী আত্মসম্মান বিক্রয় করিলেন না। তিনি শায়েস্তাখাঁর অনুরোধ রক্ষা করিতে অসম্মত হইলেন। শায়েস্তাখাঁ তাঁহার বীরোচিত ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বিদায় দিলেন। ফিরঙ্গজী বীরত্বে গৌরবান্বিত হইয়া শিবজীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য যে, মহারাষ্ট্রীয় পুরুষ সিংহ এই বীরপুরুষের সাহস ও ক্ষমতার সম্মানরক্ষায় উদাসীন হয়েন নাই। ভারতের বীরপুরুষ এক সময়ে এইরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আর্য্য গৌরবে জলাঞ্জলি না দিয়া এক সময়ে এইরূপ তেজস্বিতা ও মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

সুনীতি ও ধ্রুবের কথোপকথন।

সুঃ। বাপ ধ্রুবরে! আজ তোর ওচাঁদ মুখখানি এত মলিন দেখ্‌ছি কেন? কি বল না হয়েছে কি? বাপ তোরে কি কেউ কিছু বলেছে?

ধ্রুব নিস্তব্ধ নীরব!—বিষাদ-ভরে মুখখানি যেন ফেটে পড়্‌ছে! আঁখি দুটী ছলছল! মুখে আর কথা ফুট্‌ছে না।

সুঃ। আয় বাছনি, একবার কোলে আয়।—আমার হীরে মাণিক আঁচলের ধন—ননীর পুতুল—তোর এভাব দেখে বুক্ যে ফেটে যাচ্ছে।—আহা! ক্ষিদে পেয়েছে—তাই বাছার মুখখানি একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে। বলি ধ্রুব কিছু খা!

ধ্রুঃ। না মা—আমি কিছু খাব না,

আমায় ওকথা আর বলোনা। না খেয়ে যদি এ প্রাণ যায় যাক্—সেও ভাল, তবু—

সুঃ। ওকি বাপ তুই এমন ক'রে কাঁদিস্ কেন? কি হয়েছে খুলে সব কথা আমায় বল্ না, আমি যেমন ক'রে হোক্, এখনি তার প্রতিবিধান কর্‌ছি।

ধ্রুঃ। আজ আমায় যে কথা—(বলতে না বলতে দুই চোখ বেয়ে দর্ দর্ জল ধারা পড়্তে লাগল!)

সুঃ। কি কথা বাপ?—তবে কি-তোর বিমাতা তোরে কোন কটু কথা বলেছেন? আহা! এমন কচি ছেলে! তার প্রতি কার না দয়া হয়? নিতান্ত কঠিন প্রাণ ও পাষাণ হৃদয় নাহলে, অবোধ শিশুর প্রতি কেহ কুবাক্য প্রয়োগ কর্ত্তে পারে না!

ধ্রুঃ। মা—ওকথা আর আমায় জিজ্ঞাসা করো না, মা হয়ে আমায় যেরূপ অপমান করেছেন আর ইচ্ছা হয় না ঘরে ফিরে যাই। এই মুহূর্ত্তে গভীর গহনে গিয়ে ব্যাঘ্র ভল্লুকের মুখে আত্মসমর্পণ করে জন্মের মত মনের কষ্ট দূর করি!

সুঃ। বাপ ধ্রুবরে—অমন কথা মুখে আনিস্‌নে? তোর ও চাঁদ মুখ পানে চেয়ে এতদিন জীবিত রয়েছি—অভাগিনীর তুইবিনে বাপ আর কে আছে? চির নির্ব্বাসিতা ও বনবাসিনী হয়েও তোমাধনে পেয়ে আমি কত সুখী! তুই যদি এখন বুকে শেল বিঁধে চলে যাস্, তবে এ হতভাগিনীর আর উপায় কি হবে?

ধ্রুঃ। মা—আমি যে একষ্ট আর কিছুতেই সহ্য কর্ত্তে পারি না মা! বিমাতার বাক্যবাণে হৃদয়ের কলিজা ভেদ করেছে, এরূপ ঘা খেয়ে কেহ কি কখনো জীবন ধারণ কর্ত্তে পারে?

সুঃ। বাপ ধ্রুব—হলেও তিনি তোমার মা, মায়ের কথা মনে করে অযথা মনে কেন কষ্ট পাচ্ছ? ক্ষান্ত হও আর এ দুঃখিনীরে দুঃখনীরে ভাসাওনা—শুধু তোর ওই সুধামাখা মুখখানি দেখে আমি সব দুঃখ ভুলেগেছি, যদি সে মুখ খানি বিষণ্ণ ও মলিন দেখি, তবে কি আর এ অভাগীর দুঃখের সীমা থাকবে?

ধ্রুঃ। মা—আমার মন যে কিছু-তেই প্রবোধ মান্‌ছে না? আমাদের কি তবে এজগতে কেও নাই? এমন কেও নাই যিনি মনে করিলে এ কষ্ট দূর কর্ত্তে পারেন?

সুঃ। (ভাবিয়া) আছেন বইকি?—কিন্তু তাঁকে পাওয়া বড় সহজ কথা নয়। কত যোগী ঋষি যুগ যুগান্তর ধ্যান ধারণা করিয়াও তাঁর দেখা পায় না বাপ! তুই অবোধ বালক তরে কেমন করে সে দুর্লভ ধনের অধিকারী হবি?

ধ্রুঃ। মা—তাঁকে লাভ কর্ত্তে হলে কি কর্ত্তে হয় বলে দেও না, আমি একবার চেষ্টা করে দেখি—

সুঃ। তাঁরে পেতে হ'লে কষ্ট

সাধনের আবশ্যক নাই—কেবল সরল মনে কাতর প্রাণে ডাক্‌তে হয়—তিনি ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু, ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্ত্তে স্বয়ং তার কাছে অবতীর্ণ হন।

ধ্রু। তাঁর নাম কি—কি বলে তাঁকে ডাক্‌তে হয়?

সু:। সে পবিত্র নাম কেমন করে এ পাপ মুখে গ্রহণ করিব? এমন মধুর নাম আর এজগতে নাই—ও নাম মনের সহিত একবার লইলে আজন্মের পাপরাশি ক্ষয় হয়—অমন নাম কি আর আছে?

ধ্রু:। মা—বলনা সে নামটী একবার শুনি—ও নামের কথা তুমি আমায় আগে বলনি কেন?

সু:। বাপ—সত্যই কি শুন্‌বি? তবে শোন্ পদ্মপলাশ-লোচন হরি—তাঁর নাম—

ধ্রু:। হরি—হরি—হরি আহা! বাস্তবিকই কি মধুর নাম, বল্‌তে বল্‌তে যে মনের কষ্ট অনেক দূর হল, প্রাণটা ঠাণ্ডা বোধ হইল। কোথায় মা সেই পদ্মপলাশ-লোচন হরি?

সু:। আমি কি আর তাঁকে দেখেছি? কি জানি তিনি কোথায় আছেন? তবে শুনেছি তিনি জলে স্থলে ও আকাশে সর্ব্বত্র বিরাজমান—

ধ্রু:। মা—তবে আমি বিদায় হই, তাঁকে না পেয়ে আর ঘরে ফির্‌বনা—

সু:। বলিস কি বাপ!—দুখিনীর ধন তোরে ছেড়ে এ অভাগী শূন্য ঘরে কেমন করে থাক্‌বে? আমি প্রাণ থেকে তোকে ছেড়ে দিতে পার্ব্ব না। এই বাঘ ভালুক পূর্ণ গভীর গহনে প্রাণ পিঞ্জরের পোষা পাখী ছেড়ে দিয়ে মা কি কখনো নিশ্চিন্ত থাকতে পারে? বাছা ধ্রুবরে কোলে আয় বাপ ও চাঁদ বদনে একবার মা বলে ডাক্, তাপিত প্রাণ শীতল হ'ক?

ধ্রু:। কেঁদনা মা ঘরে যাও, ধ্রুব সুনিশ্চয়
হরি ধনে ধনী হয়ে আসিবে আবার,
ধ্রুবের প্রতিজ্ঞা এই, কভু মিথ্যা নয়;
ঘুচাইবে হরিধনে হৃদয়ের ভার।

সু:। অবোধ বালকে হেরি হরি দয়াময়,
দুখিনীর ধনে আজ দিও দরশন,
শুনিয়াছি তব নামে যার রুচি হয়,
সে পায় দেখিতে পদ্ম পলাশলোচন!

ধ্রু:। বন্দিয়া চরণ মার চলিলা তনয়,
হরির উদ্দেশে ঘোর গভীর গহনে
পশিলা ব্যাকুল হয়ে। কুসুম নিচয়,
নিরখি অবোধ শিশু সতৃষ্ণ নয়নে।
জিজ্ঞাসিল কোথা মোর হরি দয়াময়,
লুকায়ে রেখেছ নাকি সাদরে অন্তরে!
হাসিতেছে কুসুমেরা কথা নাহি কয়।
দেখিয়ে ধ্রুবের ভাব থাকিবে অন্তরে
বালকের আর্ত্তনাদ (কম কথা নয়!)
কিসাধ্য হরির তিনি থাকিবেন স্থির?
অধিকার করিলেন ভক্তের হৃদয়,
রোমাঞ্চিত হল তার সমস্ত শরীর?

বহিল প্রেমের ধারা, মহাভাবোদয়,
পুলকে পূরিল তনু আনন্দ অপার !
দিলেন অভয়দাতা ভক্তেরে অভয়,
অবসান হ'ল তার দুঃখের আঁধার ॥

(ক্রমশঃ)

পৌরাণিকী শিক্ষা।

শীর্ষক পাঠ করিয়াই পাঠক পাঠিকা হয় ত মনে করিবেন, এই প্রবন্ধে বুঝি বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় কোন কথা লিখিত হইবে। বস্তুতঃ তাহা নহে। সাধারণতঃ কিরূপ শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করা উচিত তাহাও এ প্রবন্ধে অঙ্কিত হইবে না। ইহা মনে রাখিতে হইবে যে বর্ত্তমান সময়ে যে প্রকার প্রবাহে শিক্ষা-প্রণালী চলিতেছে, বিশেষতঃ নারীজাতি বিদ্যার উন্মুক্ত দ্বার প্রাপ্ত হইয়া যে প্রকার শিক্ষা সম্বন্ধীয় সংস্কার অর্জন করিতেছেন, তাহারই যৎকিঞ্চিৎ ছায়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অঙ্কিত হইবে মাত্র।

বহুকালাবধি নানা সভায়, নানা পুস্তকে, নানা সংবাদ পত্রে শিক্ষাসম্বন্ধীয় মতামত ব্যক্ত হইয়া আসিতেছে অথচ এপর্য্যন্ত তাহার কোন একটা সীমাবধারণ দৃষ্ট হইলনা। সাময়িক পত্রেও এ সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে বাদানুবাদ হইতে দেখা যায়। তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন মত ব্যক্ত করিতে ক্রটি করেন না। কেহ মনে করেন, সারবান্ প্রয়োজনীয় বিষয় ব্যতীত অসার অপ্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে। অন্যে বলেন, নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়িণী শিক্ষা না হওয়াতে দেশের বিস্তর অমঙ্গল সাধিত হইতেছে। কাহারও মতে জ্ঞান লাভই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য, আবার অন্যের মতে সংসার নির্ব্বাহ ও ধনোপার্জন; এতদুভয় বিদ্যা-শিক্ষার চরম ফল। যাহাই হউক, আমরা ঐ সকল বড় বড় কথা লইয়া আলোচন করিতে চাহি না। শিক্ষা-গৃহের দ্বার উন্মুক্ত দেখিয়া অস্মদ্দেশের নারী জাতি যে প্রকার শিক্ষা-সংস্কার অর্জন করিতেছেন তাহারই কিয়দংশ লইয়া আলোচনা করিব।

“আর্ট অর্থাৎ শিল্পবিদ্যা বিশেষ উপকারী। মানব শিল্পবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিলে তদ্দ্বারা জীবন সুখে অতিবাহিত করা যায়, তাহাতে জগতের হিত হয়, উপকার হয়, আপনার স্বচ্ছন্দতা আইসে, ধনাগমের ও জীবিকার সহায়তাও সাধিত হয়। অতএব, শিল্প বিদ্যাই ভাল।” কথা গুলি ভাল, শুনিতে বড় ভাল, এরূপ সংস্কার আরম্ভ হওয়াও মন্দ নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে উক্ত কথা ও কার্য্য প্রতিপালন করিবার উপযুক্ত অধিকারী নির্ব্বাচিত হইতেছে না। কুলবধূ গার্হস্থ্য শিক্ষা ত্যাগ করিয়া উল লইয়া কার্পেট

বয়নে আনন্দিতা, তাহাই আর্ট! তাঁহার নিকট উত্তম খাদ্য প্রস্তুত করা আর্ট নহে।

শারীরিক পরিশ্রম না করিলে শরীর ভাল থাকেনা, শরীরে রোগ আশ্রয় করে, ক্ষুধায় হানি হয়, সুতরাং শরীরের ও মনের গ্লানি ছাড়ে না। সে জন্য মানসিক শ্রমের সমবিভাগে শারীরিক পরিশ্রম অবশ্য কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য প্রতিপালন সায়ংকালে এ পাড়া ও পাড়া বেড়াইয়া আসিতে পারিলেই সম্পন্ন হয়! এ বাড়ী ও বাড়ী করাই শারীরিক পরিশ্রম! সংসারের কার্য্য করা শারীরিক পরিশ্রম নহে।

প্রণয় বা ভালবাসা মানবাত্মার সার অলঙ্কার, প্রণয়হীন যীবন বৃথা, এখানকার এই পার্থিব প্রেম স্বর্গীয় ঈশ্বর প্রেমের আদর্শ, সেই কারণে প্রত্যেক মানবেরই চিত্তকে প্রণয়প্রবণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু স্বামী ও স্বামীর বন্ধুকে ভালবাসিতে পারিলেই প্রণয়বৃত্তি চরিতার্থ হয়! শ্বশুর শাশুড়ী দেবর ভাসুরকে ভালবাসিবার আবশ্যকতা নাই!

ধর্ম্মই মানবের অদ্বিতীয় সম্বল, ধর্ম্মই মানবের পরমাশ্রয়, ধর্ম্মহীন জীবন পশু জীবন অপেক্ষা ঘৃণিত। ঈদৃশ মহোপকারী জীবনবন্ধু ধর্ম্ম অবকাশ মত দু এক বার হরি হরি বলিলে বা ঈশ্বর ঈশ্বর বলিয়া প্রার্থনা করিলেই অর্জ্জন করা হয়; কিন্তু সত্য, পরোপকার, দয়া, ইন্দ্রিয়সংযম, ভোগবৈমুখ্য, বিষয়াসক্তিবর্জ্জন, এ সকল অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না।

ইত্যাদি ইত্যাদি সংস্কার নবীন শিক্ষা হইতে প্রসূত হইতেছে, কিন্তু পৌরাণিকী শিক্ষায় এ সকল ছিল না, তাই বলিতেছিলাম, বর্ত্তমান সময়ে যে প্রকার প্রবাহে শিক্ষা পদ্ধতির স্রোত চলিতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ভবিষ্যৎ ফল কি, তাহা একবার অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

"স্ত্রীলোকে নীতিশিক্ষা করুক। নীতিহীন জীবন পশুজীবন অপেক্ষাও ভীষণ। তাই স্ত্রীলোকে নীতি শিক্ষা করুক, বালক বালিকা সকলেই নীতি শিক্ষা করুক।" সভা, সমাজ, সংবাদ পত্র, সর্ব্বত্রই ঐ কথা। সর্ব্বত্রই ঐ একই কথা সর্ব্ববাদিসম্মত ও সকলের অনুমোদিত হইল, অমনি রাশি রাশি পুস্তক প্রকাশিত হইল। ঘাটে, পথে, বারাণ্ডায়, গাড়ীতে বাড়িতে নীতি পুস্তক হস্তে নর নারী দেখা যাইতে লাগিল! কিছু না হউক, কাজে না হউক কথায় শিক্ষা লাভ হইল—স্ত্রীলোকের চরিত্রের উন্নতি সাধন করিতে হইবে।"

নবীন নীতি শিক্ষার কথা বলিলাম, এক্ষণে পৌরাণিক নীতিশিক্ষার ইতিবৃত্ত বলি। প্রাচীন কালেও এক সময়ে এইরূপ এক মহা আন্দোলন হইয়াছিল। তৎসূত্রে অনেকগুলি পুরাণ নামক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। সে সময়ে দক্ষযজ্ঞ, দানববিজয়, সাবিত্রী সত্যবান্ কত শত,

কত কথা অবতারিত হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই।

"শৈলরাজ-দুহিতা উমা ভিখারী শিবের পত্নী হইয়া শিববৈভব ভস্মভূষা উত্তমতম ভাবিতেন ও ভালবাসিতেন। তাঁহার ভগিনীরা রত্নালঙ্কার ব্যবহার করিতেন, কিন্তু তিনি তাহা, অকিঞ্চিৎকর ও তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। পদ্মমালা, পুষ্পহার, রুদ্রাক্ষমালা, তাঁহার অতীব প্রিয় বস্তু ছিল। তিনি গো প্রভৃতি পশুরও নীচতম ভূত জীবের অধীশ্বরী হইয়া বিষ্ণুর বৈভৈশ্বর্য্য তৃণ তুল্য তুচ্ছ মনে করিতেন, তাঁহার ঈর্ষা দ্বেষ, মাৎসর্য্য, ভোগ-লালসা কিছুই ছিল না। তিনি পার্থিব সুখ অতিক্রম করিয়া উচ্চ-তম অলৌকিক সুখের অধিকারিণী ছিলেন। তাঁহার চিত্ত বিকার ছিলনা ক্লেশের লেশও ছিল না, অলৌকিক বৈভবের রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন।"

"ইনিই পূর্ব্বজন্মে দক্ষদুহিতা সতী। দক্ষ ত্রিলোকের অধিপতি, সতী তাঁহার প্রিয়তমা কনিষ্ঠা কন্যা। রাজকন্যা সতী ভিখারী শিবের পত্নী হইয়া ভিখা-রিণী হইয়াছেন। সতী ভিখারিণী হইয়া অপার্থিব ও অমানব সুখের অধি-কারিণী হইয়া বাপের বাড়ী পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার অত বড় বাপ তাঁহার ভিখারী স্বামীকে ভিখারী বলিয়াছিলেন বলিয়া অভিমানে তদ্দণ্ডে শরীর পরিত্যাগ করিতেও কষ্ট বোধ করেন নাই।"

"দানবরাজ পুলোমার কন্যা পৌলমী দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নী হইয়া ত্রিলোকের অধীশ্বরী হইয়াছিলেন। তাঁহার তাদৃশ আধিপত্য সত্ত্বেও তাঁহার ভাই ভগিনী ও মা বাপ রসাতলেও স্থান প্রাপ্ত হন নাই।"

"সাবিত্রী যে দিন দরিদ্র রাজ কুমার সত্যবানকে আত্ম সমর্পণ করিলেন, সেই দিনই তিনি নারদ মুখে তাঁহার অল্পায়ু-তার সংবাদ শুনিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার চিত্ত বিচলিত হয় নাই। সেই অবধি তিনি ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুসরণে রতা ছিলেন। ইনিও রাজপুত্রী হইয়া বনবাসে বিন্দুমাত্র কাতরা হন নাই। পরে যাহা হইয়াছিল, তাহা সকলেরই বিদিত।"

কি বুঝিলে? বুঝিলাম, পৌরাণিকী শিক্ষায় আর নবীন শিক্ষায় আকাশ পাতাল প্রভেদ। তখন স্ত্রীলোকসকল বুঝি-য়াছিলেন, বাপের বাড়ী বাড়ী নহে, শ্বশুর বাড়ীই বাড়ী; বাপের সম্পদ সম্পদ নহে, স্বামীর সম্পদই সম্পদ; স্বামীর সুখেই আমার সুখ, আমার সুখে স্বামীর সুখ। তখনকার মা বাপ এই বুঝিত কন্যা স্বামিসহধর্ম্মিণী স্বামীর সুখদুঃখভাগিনী হউক। এই ভাব প্রতিষ্ঠিত থাকায় তখনকার সমাজ পরম সুখে নির্ব্বাহিত হইত, বড় একটা আত্ম কলহ হইত না, স্বার্থপরতা ও তজ্জনিত গৃহ বিচ্ছেদ ছিল না বলিলেও বলা যায়।

স্ত্রীজাতির আত্মায় দেবভাব ও দিব্যতেজ আবির্ভূত হইত। দিব্য তেজে তেজস্বিনী থাকায় তাঁহারা দেবরাজ ইন্দ্রকেও ভয় করিত না। তাই তাঁহাদের সতীতেজ দিগন্তব্যাপী হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

লজ্জাশীলতা।

বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রী শিক্ষার সপক্ষে ও বিপক্ষে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে; যে ভাবেই আরম্ভ হউক ইহার ভবিষ্যৎ ফল শুভ হইবে বলিয়া আশা করি। সুবর্ণ দগ্ধ হইয়াই বিশুদ্ধ হয়, সত্য তর্ক বিতর্কেতেই পুনরুদ্দীপিত হয়। তাই এ দেশব্যাপী আন্দোলনে হতাশার কারণ দেখিতে পাই না; তবে কি না আগে—বাল্যকালে যাহা বড় নিকটে বোধ হইত এখন দেখিতেছি তাহা অনেক দূরে! মঙ্গলময় বিশ্বস্রষ্টার মঙ্গল উদ্দেশ্য সফল হউক—নিঃসন্দেহ তাহা হইবেই।

যাহাহউক এই বিরোধ ব্যবধানের মাঝখানেও স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক এমন কতকগুলি জিনিস আছে যে তাহাদের প্রয়োজন সকলেই অনুভব করেন। "লজ্জাশীলতা" সেই জাতীয়। "লজ্জা রমণীর প্রধান অলঙ্কার" একথা সর্ব্ববাদি-সম্মত। নির্লজ্জতার অপেক্ষা সৌন্দর্য্য-নাশক পদার্থ রমণীর আর কি আছে? বেহায়া মেয়ের রূপতো নাইই, গুণও—আমার বোধ হয়—ভাল করিয়া ফুটিতে পায় না। সৌন্দর্য্য শারীরিক বস্তু নহে, আত্মার দেবত্বই সৌন্দর্য্য। সাধু পুরুষ বা সাধ্বী রমণীর মত সুন্দর কে? শারীরিক আকৃতি যাহাই হউক তথাপি তাঁহাদের সৌন্দর্য্য অতুলনীয়!—ইহার কারণ তাঁহাদের হৃদয়ের সৌন্দর্য্যেই অপরের হৃদয় আকৃষ্ট হয়। তাই আজি আমরাও বলিতেছি, লজ্জাশীলতা রমণীর প্রধান সৌন্দর্য্য—প্রধান অলঙ্কার। লজ্জাশীলা রমণীকে অন্য বসনে সাজাইতে হয় না, তাহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের নিকট হীরা মুক্তা মলিন হইয়া পড়ে। লজ্জা রমণীর এমনই মাতৃ-দত্ত ভূষণ! এখন কথা এই প্রকৃত লজ্জা কাহাকে বলে? এ বিষয়ে মতভেদ দেখা যায়। কাহারও বিবেচনায় ঘোমটা টানিয়া বেড়ানই লজ্জা, কাহারও বিবেচনায় জড় বা মূকের মত চুপ করিয়া থাকাই লজ্জা, কাহারও মতে বাহ্যিক বা আন্তরিক বিনয়ই লজ্জা ইত্যাদি মতামত প্রকাশিত হইয়া থাকে। তবে প্রকৃত লজ্জাশীলা রমণী কাহাকে বলিব? যে রমণী নিতান্ত নিরীহের মত মুখ বুঁজিয়া থাকেন, একটী কথার উত্তর দিতে হইলে বা বয়স্কা-দিগের সহিতও আলাপ করিতে হইলে

মৃতপ্রায় হইয়া পড়েন, তিনি কি লজ্জাশীলা? আর যিনি মিষ্ট হাস্য ও শিষ্টালাপে সকলকে পরিতৃপ্ত করিতে পারেন, যাঁহার সরস সদালাপে অপরের বিষাদাকুল মনও প্রীত ও আমোদিত হইয়া থাকে, তিনি কি নির্লজ্জা? প্রথমোক্ত রমণী ব্যক্তিবিশেষের চক্ষে গৌরবান্বিতা হইলেও তাঁহার প্রকৃতি সাধারণের অনুকরণীয় নহে; আর শেষোক্ত রমণী ব্যক্তিবিশেষের নিকটে অপ্রীতিকরী হইলেও আমরা তাঁহার পদানুসরণ করিতে চাহি। "বউড়ি কে ভ্যালা চুপ" একথা সময় বিশেষেই ব্যক্তিবিশেষে প্রয়োজ্য। এজগতে সদ্ব্যবহার ও মিষ্টালাপের মত মধুর জিনিস আর কি আছে?—আর এই দুটির মত দানীয় সহজ সাধ্য জিনিসই বা মানবের আর কি আছে? অতএব এই অমূল্য সহজসাধ্য পদার্থ বিতরণ করিতে যিনি কৃপণতা করেন—প্রশংসা করা দূরে যাউক,আমরা তাঁহাকে "দুর্ভাগ্য" বলিয়া মনে করি (!)। দানীয় পদার্থের যদি "অগ্র পশ্চাৎ" থাকে, তাহা হইলে এই দু'টি জিনিস সকলেরই সর্ব্বাগ্রে দেয়। তদ্ভিন্ন ইহা দাতা ও গৃহীতা উভয়েরই পরিতুষ্টি সাধন করে। এই সকল কারণে আমরা বিষণ্ণ গম্ভীর প্রকৃতির সহিত সহানুভূতি করিতে পারি না এবং নীরব নিশ্চল প্রকৃতিকেও "বাস্তবিক লজ্জাশীলতা" মনে করি না। লজ্জাশীলতা কেবল ঘোম্‌টা টানাও নহে, কেবল বিনয়ও নহে।—আসল কথা লজ্জা কোনও "মূল পদার্থ" নহে, "যৌগিক পদার্থ" মাত্র।—কোনও একটী বৃত্তির নাম লজ্জা নহে, কতকগুলি বৃত্তি ও শক্তি একত্রিত হইয়া যাহা প্রস্তুত হয়, তাহারই নাম "লজ্জা" বলা যায়। এই বৃত্তিগুলি "মূল পদার্থ" ও লজ্জার উপকরণ বলিয়া আমরা যথাসাধ্য ইহাদিগের বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

লজ্জার প্রথম উপকরণ নম্রতা—নম্রতা মানব-হৃদয়ে যেমন মধুর, সেই রূপম শক্তিমতী। নম্রতার কার্য্য বিনয়। বিনীত মুখের সর্ব্বত্রই জয়। হিংসাকে ভালবাসায়, শত্রুকে মিত্রে পরিণত করিবার ক্ষমতা কেবল বিনয়েরই আছে। বিনয়ীর মুখে কেমন এক সৌন্দর্য্য আছে, তাহা দেখিলে নিতান্ত পাষাণ হৃদয়ও স্নেহোদ্বেলিত না হইয়া থাকিতে পারে না। এ জগতে নিতান্ত নর-পিশাচ বা নরপিশাচী ভিন্ন অন্য কেহ বিনয়ীর শত্রু হইতে পারে না। বিনয়ের সংস্পর্শে মানব-হৃদয়ের অহঙ্কার চূর্ণ হয়, ঔদ্ধত্য দূর হয়, মানবহৃদয় স্বর্গবৎ প্রতীয়মান হয়। বিনীত ব্যক্তি বিশেষ কারণে কাহারও প্রতি বিরক্ত বা কুপিত হইলে, তাহাকে কর্কশ ভাবে কি রুক্ষ শাসনে ব্যথিত করিতে পারেন না, পরের অন্তরে ব্যথা দিয়া কখনও আমোদানুভব করিতে পারেন না। তিনি আত্মপ্রাধান্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক বা যশের লোভেই অন্ধ

হল না। তাঁহার আলাপ মধুর, ব্যবহার মধুর, হৃদয়খানি মধুরতায় পূর্ণ! অহঙ্কার বিনয়ের শত্রু। বিনয় দশজনের জন্য, অহঙ্কার কেবল আপনার জন্য, মানবকে নিয়োজিত করে। অহঙ্কারী আপনার ভরে আপনি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, সে যেন কেবল আপনাকে লইয়া থাকিতেই জগতে আসিয়াছে! অহঙ্কার মানবকে বাস্তবিকই এক সৃষ্টিছাড়া পদার্থ করিয়া তোলে! তাহার হৃদয় যেন একটী অরক্ষিত রাজ্যের মত যথেচ্ছচারিতায় পূর্ণ! নিজের শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়ের মুখে আত্মদোষের কথা শুনিলেও তাহার অসহ্য হয়। সে জগৎকে ঘৃণার চক্ষে দেখে, জগৎও তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে। যাঁহার মনে অহঙ্কার আছে, তাঁহার অন্যান্য শত গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু লজ্জাশীলতা অবশ্য নাই। লজ্জাশীলের আত্মাদর আছে, নির্লজ্জ ব্যক্তিই অহঙ্কারের বোঝা বহিতেছে। নম্রতা ও অহঙ্কার, আলোক ও আঁধার। একের অভ্যুদয়ে অপর বিনষ্ট হয়। তাই বলিতেছি, এই বিশাল মানবজগতে আমি কতটুকু বস্তু? এই বিষয় যত ভাবিবে, হৃদয় ততই বিনম্র হইবে। অপর ব্যক্তিদিগের মহত্ত্বের বিষয় যতই চিন্তা করিবে, আত্ম-হৃদয় ততই বিনম্র হইবে। এই উপায়ে রমণী অহঙ্কার পরিহার ও নম্রতা অভ্যাস করিতে পারিবেন। এজগতে নম্রতা ব্যতীত লজ্জাশীলতা গঠিত হয় না।

লজ্জাশীলতার দ্বিতীয় উপকরণ সঙ্কোচিতা—যেমন এক পক্ষীয়েরা বিনয়কে লজ্জা বলেন, সেইরূপ অপর পক্ষীয়েরা সঙ্কোচকেই লজ্জা মনে করেন। সেকালে সত্য, দ্বাপর নহে, আমাদেরই ঠাকুরমা দিদীমাদিগের সময়ে এই সঙ্কোচিতাই প্রধানতঃ লজ্জারূপে পরিগণিত ছিল। আমরাও সঙ্কোচিতাকে লজ্জার উপকরণ বলিয়া বিবেচনা করি। সঙ্কোচিতা রক্ষা করিতে বঙ্গবধূর ঘোমটা, ইংলণ্ডীয় মহিলাদিগের "জাল," আরব রমণীর "মুখোস।" রমণী সর্ব্ব সাধারণের দৃষ্টি-পথে পতিত হইলে, তাঁহার অন্তরে কি এক জড় সড় ভাব উপস্থিত হইতে থাকে, তিনি আপনা আপনি আপনাকে অস্বচ্ছন্দ বোধ করেন। এই ভাব হইতে রমণী-জীবনের স্বতন্ত্রতা। এই ভাবকে আমরা সঙ্কোচিতা বলিতেছি। সঙ্কোচিতার বাড়াবাড়িতে রমণী জীবন জড়প্রায় হয় এবং সঙ্কোচিতা রক্ষা করিতে রমণী কেবল ঘরের কোণে বসিয়া দিন কাটাইবেন, ইহা অবশ্য অন্যায়। তবে এই স্বাভাবিক বৃত্তি উপযুক্তরূপে পরিবর্দ্ধিত হইতে দেওয়া লজ্জাশীলা রমণীর অবশ্য কর্ত্তব্য। সঙ্কোচিতা রক্ষা করিতে রমণী, কোনও পুরুষের সহিত প্রগল্‌ভতা করিবেন না, কোনওরূপ অসংযতাবস্থায় তাঁহাদিগের নিকটে যাইবেন না, এবং হীনচরিত্র বা অজ্ঞাতচরিত্র পুরুষের সম্মুখীনা হইবেন না; সঙ্কোচিতা হইতে রমণী, পুরুষমাত্রকেই এক প্রকার সম্ভ্রম

করেন, রমণী যে কথা মাকে বলিতে পারেন, সে কথা বাপকে বলিতে পারেন না, যে কথা প্রাপ্তবয়স্কা ভগিনীকে বলিতে পারেন, সে কথা প্রাপ্তবয়স্ক ভাইকে বলিতে পারেন না, কারণ পরস্পরের জাতীয় সম্ভ্রম। যখন একান্ত আত্মীয়দিগের নিকটে জাতীয় সম্ভ্রম আবশ্যক, তখন অপরের নিকটে যে অবশ্য কর্ত্তব্য একথা বলা বাহুল্য মাত্র। বড় দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে ঘোমটা টানা ভগিনীদিগের মধ্যেও জাতীয় সম্ভ্রম বা সঙ্কোচিতার বিরুদ্ধ কথা শুনিতে হয়। বাসর জাগা ও তীর্থদর্শন প্রভৃতি উপলক্ষে বঙ্গরমণীগণ যে রকম কুরুচির পরিচয় দেন, তাহা শুনিলে লজ্জায় মরিয়া যাইতে হয়*। লজ্জাশীলতার অনুরোধে বঙ্গরমণী জীবন বিসর্জ্জন দিতেও কাতর হন না, আর লজ্জাশীলতার অন্তরায় স্বরূপ এই সকল কদাচার কি তাঁহারা পরিত্যাগ করিবেন না? যতদিন না করিবেন, ততদিন তাঁহাদের লজ্জাশীলতাও সুরক্ষিত হইতে পারিবে না। আর এক কথা, সঙ্কোচিতার অনুরোধে বঙ্গরমণীর পরিচ্ছদের উৎকর্ষ সাধন অবশ্য কর্ত্তব্য। লজ্জাশীলা রমণীতো পাতলা কাপড় পরিতেই পারেন না, কিন্তু পুরু কাপড় হইলেও কেবল একখানি মাত্র সাড়ী বা ধুতী হইতে লজ্জা সম্ভ্রম রক্ষা হয় না। আত্মীয় পুরুষদিগের সম্মুখে যাইতে হইলেও কত জড় সড় হইতে হয়। আমাদের এদেশ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ, এদেশে রাশীকৃত বস্ত্রাদি পরিধার আবশ্যকতা হয় না; তবে লজ্জাশীলতার অনুরোধে প্রাপ্তবয়স্কা রমণী, কুমারী হউন, সধবা হউন আর বিধবাই হউন, একটী সেমিজ পরিয়া তাহার উপরে কাপড় পরিলেই চলে। ইহাকেও যাঁহাদিগের অসুবিধা বোধ হয়, তাঁহারা একটা পুরু লংক্লথ বা জিন সিটিনের বডি গায়ে রাখিতে পারেন। হাতা ছোট হইলে গৃহকার্য্যেও অসুবিধা হয় না, লজ্জাশীলতাও রক্ষা হয়। তবে যিনি পাতলা কাপড় পরিতে বাধ্য, তিনি সেমিজ না পরিলে তাঁহার কাপড় পরার উদ্দেশ্য বিফল হয়, একথা সকলের স্মরণীয়। এতদ্ভিন্ন বিকট উচ্চ হাসি, চেঁচান প্রভৃতিও সঙ্কোচিতার অনুরোধে রমণীর পরিহার্য্য।

লজ্জাশীলতার তৃতীয় উপকরণ স্থিরতা—চাঞ্চল্য লজ্জাশীলতার ব্যাঘাত জন্মায়। লজ্জাশীলা রমণী শান্ত স্বভাবা। কথা, কার্য্য বা চিন্তা কোনও বিষয়ে তিনি স্থিরতা অতিক্রম করেন না। সহসা কাহাকে কটু বাক্য বলা, ঝগড়া করা, স্বার্থপরতায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হওয়া এ সকল চঞ্চল স্বভাবের লক্ষণ। শান্ত স্বভাবা রমণী কখনও এরূপ কার্য্য করেন না। তিনি সহসা বিরক্ত বা উত্তেজিত হন না; তাঁহার কর্ত্তব্য,

* বামাকুলহিতৈষী ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার লিখিত "বাঙ্গালির মেয়ের নীতিশিক্ষা" পুস্তকে এই সকল বিষয় বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বঙ্গমহিলার অবশ্য পাঠ্য।

তিনি ধীরভাবেই পালন করেন *। এ জগতে মানব জীবন অসম্পূর্ণ—আদর্শ জীবন কচিৎ মিলে। সেই জন্যে পরের কোনও রূপ ত্রুটিতে ক্রোধান্ধ হইয়া অভদ্রোচিত ব্যবহার করা মানব মাত্রেরই অকর্ত্তব্য। যে রমণী দাস দাসীদিগের প্রতি কর্কশ ব্যবহার করেন, শাশুড়ী, ননদিনী বা যাতাদিগের সহিত মুক্তকণ্ঠে বিবাদ কলহ করেন এবং বিশেষ কারণ ব্যতীত সন্তানদিগের পিঠে মুক্তহস্তে চড় চাপড় প্রয়োগ করেন, তিনি কখনই শান্তস্বভাবা নহেন বা তাঁহার লজ্জা-শীলতা উপযুক্তরূপে পরিস্ফুট হয় নাই। তবে এ জগতে "শাসন" কখনও দোষা-বহ নহে। পারিবারিক জীবনে সুশা-সনের বহুল প্রয়োজন। সেই জন্যে রমণী যখন সন্তান বা দাস দাসীদিগের শাসনকর্ত্রী হইবেন, বিশেষ আবশ্যক হইলে রুক্ষ শাসনও প্রয়োজ্য—কিন্তু বিশেষ সাবধান হইতে হইবে যেন স্থির-তার সীমা অতিক্রান্ত না হয়, যেন লজ্জা-শীলতার হানি না হয়। শান্তস্বভাবা রমণী সুখ দুঃখে একান্ত "আত্মহারা" হইয়া পড়েন না, সংসার তরঙ্গের বিক্ষোভে হা'ল্ দাঁড় ছাড়িয়া দেন না! সুখ দুঃখ স্থির ভাবে বহন করেন। তিনিও বীরমাতা মেরি ওয়াসিংটনের মত প্রাণাধিক পুত্রের অমানুষিক কীর্ত্তিকলাপ ও দেববাচিত যশ শুনিয়া পুলকে দিশা-হারা হন না, ধীরে ধীরে সংবাদদাতা (মার্ক্বুইস্ ডি লেফেট) কে বলিতে পারেন "জর্জ্জি খুব ভাল ছেলে, সে যে এ রকম কায করিবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি?" !! ধন্য মেরী ওয়াসিংটন! তুমি যে দেশের লোক হওনা কেন, বঙ্গ-বাসিনীদিগকে আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার মত দেবীর স্থৈর্য্য তাহারা গ্রহণ করিবার যোগ্যা হয়। স্থিরতা লজ্জা-শীলা রমণী কুলের অবশ্য গ্রহণীয়।

লজ্জাশীলতার চতুর্থ উপকরণ সহি-ষ্ণুতা—লোকে রমণী জাতির সহিষ্ণুতার সহিত মা বসুমতীর সহিষ্ণুতার তুলনা করিয়া থাকেন। পৃথিবী-মূর্ত্তি সহি-ষ্ণুতার আদর্শ। জগতে প্রাকৃতিক নিয়মে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত বসন্তাদি যাইতেছে আসিতেছে, ঝড় জল, বজ্রাঘাত, অগ্ন্যুৎ-পাত, ভূমিকম্প প্রভৃতি নৈসর্গিক উৎ-পাত ঘটনা হইতেছে, মানবগণ আহার, পানীয় ও বাসের আশয়ে প্রতি নিয়তই বসুধা-বক্ষ বিদীর্ণ করিতেছে, তথাপি বসু-মতী জননী অকাতরে সকলই সহ্য করিতেছেন। এই জড় সহিষ্ণুতার ন্যায় জীবন্ত সহিষ্ণুতা রমণী-হৃদয়ে সম্ভবে। যে জাতি মাতা, ভগিনী, ভার্য্যা, কন্যা ও গৃহিণীরূপে নরনারীগণের পরিচর্য্যা করিতে নিরতা, সে জাতির, সহিষ্ণুতা তো স্বাভাবিক সম্পত্তি। এই স্বাভা-বিক সম্পত্তি হারা হইলে রমণী নিতান্ত দীনা হইয়া পড়েন। তাঁহাদের লজ্জা-শীলতাও অসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে। যে কর্ণধার প্রবল তুফানে নৌকা রক্ষা

* অব্যবস্থিত চিত্ত বা বদমেজাজি রমণীর বড় কলঙ্ক। তাহা চাঞ্চল্যেরই ফল।

করিতে পারেন তিনি যেরূপ প্রশংসনীয়, যে ব্যক্তি সংসারের ঘূর্ণাবর্ত্তে নিজের সহিষ্ণুতা রক্ষা করিতে পারেন, তিনিও সেইরূপ প্রশংসনীয়। আমাদের দেশে প্রাচীনা মহিলাগণ সহিষ্ণুতার জীবন্ত মূর্ত্তি স্বরূপ। তাহাদিগের সহিষ্ণুতার বিষয় আলোচনা করিতে, গিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। এমন কথাও শুনিয়াছি, তাঁহারা ক্ষুধা তৃষ্ণায় মৃতপ্রায়া হইলেও আত্মীয়দিগের নিকটে সে কথা প্রকাশ করিতেন না, গুরুতর রোগে আক্রান্ত হইলেও স্বামী প্রভৃতির কর্ণগোচর করিতে দিতেন না! আমি এরূপ সহিষ্ণুতাকে সহস্র ধন্যবাদ দিতেছি, কিন্তু ভরসা করি বামাবোধিনী পাঠিকাদিগের মধ্যে এরূপ সহিষ্ণুতা কেহই অবলম্বন করিবেন না। প্রকৃত সীমা অতিক্রম করিলে অমৃতও বিষে পরিণত হয়, বাড়াবাড়ি সকল বিষয়েই অনর্থকর। তবে যেখানে সহিষ্ণুতা আবশ্যক, সেখানে অসহিষ্ণু হইলে রমণীর বড় নিন্দার কথা। কমলার জর হইয়াছে, চিকিৎসাও হইতেছে; কিন্তু জরের অনেক জ্বালা, মাথাধরা, গায়ের জ্বালা, হাত পা কামড়ানি ইত্যাদি; কমলা যদি ধীর ভাবে এই যন্ত্রণা গুলা সহ্য করেন, তাহা হইলে তাঁহার সহিষ্ণুতার গৌরব—তাঁহার লজ্জাশীলার প্রশংসা; নচেৎ তিনি যদি অসহিষ্ণুতার জন্য "বাবারে, মারে গেলুম রে!" ইত্যাদি রবে চীৎকার করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার সহিষ্ণুতা শক্তি নিস্তেজ বলিতে হয় এবং লজ্জাশীলতারও ত্রুটি অনুভূত হয়। এইরূপ গৃহকর্ম্ম, আত্মীয়গণের সেবা শুশ্রূষা, দুঃখ, বিপদ প্রভৃতি হইতে সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়। ছোট বড় সকল বিষয়েই যিনি সহিষ্ণুতা-পরায়ণা, তাঁহার লজ্জাশীলতাই গৌরবান্বিত।

লজ্জাশীলতার পঞ্চম উপকরণ পবিত্রতা—আমরা এতক্ষণ যে সকল বৃত্তি ও শক্তির কথা বলিলাম, সে গুলি লজ্জাশীলতার অস্থি, চর্ম্ম, রক্ত ও মাংসাদি স্বরূপ, আর পবিত্রতাই লজ্জাশীতার প্রাণ। লজ্জাশীলতার মুখ্য উদ্দেশ্য পবিত্রতা। সেই জন্যে পবিত্রতার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হইলেও লজ্জাশীলার দারুণ অবনতি হয়। মন্দ চিন্তা করিলে, মন্দ পুস্তক পড়িলে, মন্দ কথা বলিলে এবং মন্দ লোকের সহিত বেড়াইলে মানুষ মন্দ কাজে অভ্যস্ত হয়; এই সকল দোষের একটী মাত্রও চরিত্র স্পর্শ করিলে পবিত্রতার ক্ষতি হয়। পবিত্রতাহীন হইলে রমণী জীবন রাক্ষসী জীবনে পরিণত হয়। অতএব রমণী প্রাণপণ চেষ্টায় চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করিবেন। ফুলের গাছ অনেক যত্নে বাড়াইতে হয়, কাঁটা গাছ আপনা হইতেই বাড়ে। উদ্যান-রক্ষক যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া তাহাদিগকে উৎপাটন করে। মানবের সদ্বৃত্তিগুলি এই ফুলের গাছের মত; সদ্বিষয় আলোচনা কর, সচ্চিন্তায় মনোনিবেশ কর, সজ্জনের সঙ্গ গ্রহণ কর, তাহা হইলেই

সাধুতা অভ্যাস হইবে, ফুল ফুটিয়া—সংস্কার পারিজাত ফুটিয়া তোমার হৃদয়কে নন্দন বন করিবে। অসদ্বৃত্তিগুলি কাঁটা গাছের মত, তাহাদের বিষয়ে মানব একটু অলস বা অন্যমনস্ক হইলেই তাহারা নন্দন বন কণ্টকাকীর্ণ করিতে চায়। আমরা যদি বিবেককে সর্ব্বদা জাগাইয়া রাখি, যদি বিবেক আমাদের উদ্যানরক্ষক রূপে সর্ব্বদা সতর্ক থাকেন, তাহাহইলে কাঁটা গাছগুলা আমাদের ফুল বনে কখনও জন্মিবে না; তাহারা যে উদ্দেশ্যে জন্মিয়াছে, তাহাই সাধন করিবে (১), আমাদের পবিত্রতার বিকাশের পক্ষে বাধা দিতে পারিবে না। আত্মসংযম, সংযতেন্দ্রিয়তা ও সদ্বৃত্তির অনুশীলনের ফলই পবিত্রতা। একজন পুণ্যবান বা পুণ্যবতীর সহিত পাপাত্মা বা পাপীয়সীর তুলনায় কত দূর পার্থক্য অনুভূত হয়! আলোকে আঁধারে, ভালবাসা হিংসায়, স্বর্গে ও নরকে যেরূপ প্রভেদ, ইহাদিগের পরস্পরেও সেইরূপ প্রভেদ! ইহার কারণ একজন পবিত্র অপরে অপবিত্র! একজন দেবতা আর একজন নারকী! এই পবিত্রতারূপ স্বর্গীয় জ্যোৎস্না হৃদয়ে প্রতিভাত করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? আমরা এই স্বর্গীয় পদার্থকে হৃদয়ের হার করিতে শিখিব কবে?

(১) "নিকৃষ্ট বৃত্তি" অর্থে কাম্যসাধিনী বৃত্তি। তবে ইহাদিগের দ্বারা যে মানবের ক্ষতি হয়, সে মানবের দোষে। একথা ভবিষ্যতে বলিতে ইচ্ছুক রহিলাম। প্রঃ লেঃ।

পবিত্রতার অনুরোধে রমণী অপবিত্র চক্ষের সম্মুখে প্রকাশিত হইবেন না; পবিত্রতার ক্ষতিকর ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কার্য্যেও প্রবৃত্ত হইবেন না। আমোদ প্রমোদের সময়ে বয়স্যাদিগের প্রতি কোনও বিশ্রী ঠাট্টা তামাসা করিবেন না। জগতে বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদের শত শত জিনিস আছে; প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, সুন্দর শিল্প, সুরুচিসম্পন্ন সুমধুর কবিতা ও সঙ্গীতাদি, হাস্যরসপূর্ণ বিশুদ্ধ গল্প ও তামাসা, এই সকল হইতে লোকে যেরূপ প্রীত হন, তাঁহাদের হৃদয়ও সেইরূপ উন্নত হয়। তাই বলিতেছি দেশীয় ভগিনী এই সকল পবিত্র আমোদ উপভোগ করিয়া আপনার রুচি অধিকতর পবিত্র করিবেন।

পবিত্রতা সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিতে বাকি; কথা কি না ধর্ম্ম ও সত্য পবিত্রতার জীবনী। ধর্ম্মই পবিত্র, সত্যই পবিত্র। যিনি পবিত্রতা লাভ করিতে চাহেন, তিনি ধর্ম্ম ও সত্যে আত্মসমর্পণ করিবেন। অধর্ম্ম ও অসত্যের নাম অপবিত্রতা।

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ পবিত্রতার সনাতন ক্ষেত্র। গৌতমী, মৈত্রেয়ী, সীতা, সাবিত্রী হইতে খনা, লীলাবতী, রাণী ভবানী, রাণী শরৎসুন্দরী পর্য্যন্ত পবিত্রপ্রাণা দেবীগণ এইখানে বিরাজ করিয়াছেন। ভারত-ভাণ্ডারে ধন নাই তাতে বড় দুঃখ ভাবি না, যদি ভারত কন্যার হৃদয়ে পবিত্রতা রত্ন—তাঁহাদিগের জাতীয়

সম্পত্তি অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা হইলে এসকল দুঃখেও সুখের বিষয় আছে, সৌভাগ্যও আছে! এরূপ দুঃখই আমাদের প্রার্থনীয়।

পবিত্রতা হৃদয়োদ্যানে লজ্জাবতী লতা। লজ্জাবতী মানব-কর স্পর্শে যেরূপ সঙ্কুচিত হয়, পবিত্রতা অপবিত্রতার বাতাস বহিলেই সেইরূপ সঙ্কুচিত হয়। পবিত্রতাকে স্বাভাবিক শক্তিতে বাড়িতে দেওয়াই রমণীর কর্ত্তব্য। তাহা হইলে আর কিছুই করিতে হইবে না, লজ্জাশীলতা জীবন্ত রূপে রমণী হৃদয়ে বিরাজ করিতে পারিবে।

লজ্জাশীলতা রমণীর প্রথম শিক্ষণীয়। আগে রমণীকে লজ্জাশীলতা তার পরে অন্য শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। এ শিক্ষায় অর্থব্যয়ও করিতে হয় না, গুরুতর শ্রমও করিতে হয় না। জগদীশ্বর মানব-হৃদয়ে যে নম্রতা, সঙ্কোচিতা, স্থিরতা, সহিষ্ণুতা ও পবিত্রতা-পিপাসা দিয়াছেন, তাহাই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া, তাহাই মিলিয়া মিশিয়া রমণীর প্রধান অলঙ্কার লজ্জাশীলতা রূপে পরিণত হয়। ইহার জন্যে আমাদের ইচ্ছা, চেষ্টা ও যত্ন আবশ্যক। লজ্জাশীলতা শিক্ষাকে "বিকল্পে" নীতি শিক্ষা বলা যায়।

শ্রীমাঃ।

রিপু-পরাজয়।

(১)

পরিখা বেষ্টিত দুর্গে কিবা প্রয়োজন?
কামান বন্দুকে কিবা হইবে সাধন?
বর্ম্ম চর্ম্ম নাহি চাই, অসিতে কি হবে ভাই!
কি কাজ করিবে তীক্ষ্ণ শর শরাসন?

(২)

মুষল মুদ্গরে আর কি হবে উদ্ধার?
হানাহানি কাটাকাটি মারামারি সার!
নাহি চাই রণ-তরী, নাশিতে দুর্জ্জয় অরি,
তুরি ভেরী জয়ঢাকে কি হবে আমার?
এ সব দস্যুর কাজ দস্যু-ব্যবহার!

(৩)

দিনেমার, ওলন্দাজ, ফরাসী, সিপাই,
যান্‌কোরা জাহাজীগোরা কি করিবে ভাই?
বীর ব্লেক্, নেলসন্, নেপোলীন, ওলিংটন,
কি করিবে এরা সবে ভাবিয়া না পাই,
এত রণ-সজ্জা মোর কিছুই না চাই।

(৪)

চাই আমি ভালবাসা হৃদয়ের বাণ,
তাই দিয়া রিপুগণে পূরিব সন্ধান;
দেখিব কেমন অরি, জিতি কিম্বা হারি মরি,
আতঙ্কে নহেত মোর কম্পিত পরাণ,
সরল সাহসে তাই ডাকি ভগবান্।

(৫)

বিনা রক্তপাতে রিপু হবে পরাজয়,
এর চেয়ে সুখ কিবা মানুষের হয়?
একদিনে নাহি পারি, দশদিন মারি মারি,
রিপুরে ভূতলশায়ী করিব নিশ্চয়,
অব্যর্থ আমার বাণ ফিরিবার নয়।

বিশ্বসেবা ব্রতে স্ত্রীলোকের সহকারিতা।*

যে বিধাতার বিধানে এই অনন্ত বিশাল বিশ্বসংসারে মানবের পদার্থ জ্ঞান জন্মিবার জন্য এবং যাবতীয় পদার্থ কার্য্যকারী হইবার নিমিত্ত আলোক অন্ধকার, উত্তাপ শৈত্য, কঠিন তরল, সুদৃঢ় সুকোমল, সুখ, দুঃখ, শান্তি, অশান্তি প্রভৃতি বিপরীতধর্ম্মী পদার্থ ও ভাব সমূহ বিদ্যমান, সেই বিধাতারই বিধানে স্ত্রী-প্রকৃতি ও পুরুষ-প্রকৃতিও অনেকটা বিপরীতধর্ম্মী ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। এ বিশ্বের মূল নিয়মই এই যে, দুই বিপরীত ধর্ম্ম একত্র কাজ করিবে। শুধু আকর্ষণে এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এক নিমেষের তরেও তিষ্ঠিত কি? কেবলই উত্তাপ—অশেষ গুণাধার হইলেও অনন্ত উদ্ভিদ ও অনন্ত প্রাণিপুঞ্জময় জগৎকে জীবিত রাখিতে সক্ষম হইত কি? কেবল মাত্র কঠিন উপাদান সমূহের সংমিশ্রণে গগণস্পর্শী মহা সৌধ নির্ম্মিত হয় কি? নিরবচ্ছিন্ন সুখ শান্তি মনুষ্যকে সুখ শান্তি প্রদান করিতে পারে কি? শুধু জ্ঞান হৃদয়কে সুখময় ও শোভান্বিত করে কি? কেবল মাত্র ভাবরাশি জীবনকে ঠিক পথে চালাইতে পারে কি? তবে কেন বিশ্বসেবারূপ মহান্ ব্রত সাধনের সময় এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে?

বিশ্ব সেবার ন্যায় মহাব্রত কেবল পুরুষজাতি কিম্বা কেবল স্ত্রীজাতির দ্বারা কখনই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও মনোহর ভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না। এ মহাব্রত সংসাধনের পথে এমন অনেক স্থল উপস্থিত হয়, যেখানে বিশ্ব-সেবক নারী-প্রকৃতির সহায়তা ব্যতীত অগ্রসর হইতে পারেন না। এমন অনেক অবস্থার সংঘটন হয়, যখন পুরুষ-প্রকৃতি বিশ্ব-সেবক অপেক্ষাও নারী-প্রকৃতিময়ী বিশ্ব-সেবকের আবশ্যকতা বিশেষরূপে অনুভূত হয়। হে বিশ্বসেবাব্রতধারী! জীবন্ত-বিশ্বাস, একান্ত অধ্যবসায় ও জ্বলন্ত-উৎসাহ ভরে সত্যপূর্ণ জ্ঞান ও ধর্ম্ম-প্রচার করিতে গিয়া, যখন তুমি তীক্ষ্ণধার জ্ঞান অস্ত্রে কুসংস্কার ও কুনীতির মস্তক ছেদন এবং সুসংস্কার ও সুনীতির রাজসিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে অতুল সাহসে অগ্রসর হইয়া কত শত লোকের অপমান, নির্যাতন ও প্রতিবন্ধকতাচরণে ক্লিষ্ট, ম্রিয়মাণ, অধৈর্য্য ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িবে; তখন কি পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকের মুখের উৎসাহের জ্যোতি, স্ত্রীলোকের আশ্বাসবাক্য, স্ত্রীলোকের ধৈর্য্য ও সহকারিতা তোমাকে ব্রত সাধনের জন্য অধিকতর নব বল, নব উৎসাহ, নব অনুরাগে অগ্রসর করিবে না? আর এক কথা এই যে, স্ত্রীলোকের হৃদয়ে সুসংস্কার ও সুনীতি প্রতিষ্ঠিত ও চির অঙ্কিত করিয়া দিতে স্ত্রীলোকের যেমন কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা, তোমার

---

* বামাবোধিনী জুবিলী উপলক্ষে শ্রীমতী বসন্তকুমারী কর্ত্তৃক লিখিত।

সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই; কেননা স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকেরই অনুকরণ করিয়া থাকে, আর তাই করাই, অর্থাৎ ভাল স্ত্রীলোকের অনুকরণ করাই স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য। একটী সুশিক্ষিতা সুন্দরহৃদয়া স্ত্রীর আদর্শ সম্মুখে থাকিলে নিকটস্থ অনেকগুলি স্ত্রী-হৃদয় সুন্দর হইয়া যায়। যখন তুমি দেশব্যাপী মহামারী কিম্বা দুর্ভিক্ষপীড়িত জনপদ সমূহের দুঃখ শোকে কাতরহৃদয় হইয়া তাহাদের কল্যাণ সাধনার্থ মনোযোগী হইবে, যখন তুমি অনাহারে বুভুক্ষিত রোগ শোক মৃত্যুর হুহুঙ্কারে ভীত প্রপীড়িত ধূলায় বিলুণ্ঠিত অসহায় নর নারী ও শিশু-সন্তানগণের দিকে আকুল হৃদয়ে ছুটিয়া যাইবে তখন কাহার ধর্ম্মনীতির সমুজ্জল প্রভা—কাহার নিঃস্বার্থ দয়াপূর্ণ কাতরোক্তি—কাহার নয়ন যুগলের বারিধারা তোমাকে প্রাণপণে কার্য্য করিতে প্রোৎসাহিত করিবে! যখন তুমি বিশ্বসেবার তরে তোমার জ্ঞান বুদ্ধির ফলস্বরূপ উত্তম উত্তম গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে বসিবে, তখন সহকারিণী স্ত্রীলোক কি কতকগুলি এমন ভাব গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়া দিবে না যাহা তোমার নিজের কিম্বা অন্য কোন পুরুষের নিকট পাইবার সম্ভাবনা অল্প, যাহা দেখিয়া তুমি মোহিত, চমৎকৃত, উপকৃত ও পরম সুখী হইবে।

যেমন দুই হস্তের কার্য্য এক হস্তে কখনও সহজে সম্পন্ন ও সম্পূর্ণাবস্থাপ্রাপ্ত হইতে পারে না, পারিলেও তদ্রূপ সুন্দর হয় না, তেমনি বিশ্বসেবা ব্রতে স্ত্রীলোক সহকারিণী না থাকিলে ব্রত যে কেবল অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকিবে তা নয়, তাহার সৌন্দর্য্যেরও বিলক্ষণ হানির সম্ভাবনা। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে গৌরবান্বিত দুই পদার্থ একত্র কার্য্য না করিলে জগতে কিছুরই ত শোভা নাই! যখন অনন্ত নীলাকাশে স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় পূর্ণচন্দ্র প্রকাশিত হয়, তখন সে সুগভীর শোভা দর্শনে মন কতই না মোহিত হয়! যখন সু-বিস্তীর্ণ রমণীয় সরসীর মাঝে মনোহারিণী সরোজিনী প্রস্ফুটিত হয়, তখন সে মনোরম সৌন্দর্য্যে কাহার চিত্ত না পুলকিত হয়! যখন নয়নরঞ্জন হরিৎবর্ণ পত্রের ঘন সন্নিবেশের মধ্যে সুন্দর লোহিতবর্ণ ফুল ফুটিয়া দুলিতে থাকে, তখন সে সুষমা-ছটায় কে না মুগ্ধ হয়! যখন নানা দেশ-জাত বিবিধ ফল পুষ্পের বৃক্ষ লতাময় সুদৃশ্য সুরম্য উদ্যানে কলকণ্ঠ বিহঙ্গম সুস্বর লহরী ছড়াইতে থাকে, তখন কাহার মনঃপ্রাণ কাড়িয়া না লয়! শুধু জড় পদার্থই বা কেন, মনুষ্য-হৃদয়ের দিকে চাহিয়া দেখিলেও ঐ নিয়মই দেখিতে পাওয়া যায়। যখন ভক্তির সহিত নম্রতা, শ্রদ্ধার সহিত কৃতজ্ঞতা, প্রীতির সহিত পবিত্রতা, সাধুতার সহিত উদারতা, স্নেহ করুণার সহিত অনুকূলতা, প্রভৃতি একত্র কার্য্য করে, তখন তাহার কতই না মহিমা—কতই না গরিমা—কতই না সুষমা প্রকাশিত হয়। এসব বিচিত্র শোভার মূল

কারণ যিনি, নর নারীর দেহ মন ও প্রকৃতিবৈচিত্র্যেরও মূল কারণ তিনি। যখন উন্নতমন ধর্ম্মাত্মা নর নারী অপার্থিবভাবে মিলিত হইয়া বিশ্ব-সেবাব্রত পালন করিতে থাকিবেন, তখন তাঁহারা কি স্বর্গীয়—কি অনির্ব্বচনীয়—কি অবর্ণনীয় শোভাই না ধারণ করিবেন।

স্ত্রীলোক সহকারিণী থাকিলে পরম পবিত্র বিশ্ব-সেবাব্রত সুচারুরূপেই সম্পন্ন হইতে পারিবে সন্দেহ নাই ; কিন্তু সে সহকারিণী স্ত্রীলোক কেমন স্ত্রীলোক ? বিশ্বসেবাব্রত কি উচ্চতম ব্রত ? ইহার কার্য্য কত অসীম, এ ব্রতের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া কে শেষ করিতে পারে ? ইহার পুণ্যফলে যে গভীর আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়, তাহার তুলনা কোথায় ! এ ব্রত সম্যক্ প্রকারে পালন করিতে পারা সাধারণ লোকের সাধ্যায়ত্ত নয়। এ ব্রতধারী হইতে হইলে আপনাকে অসাধারণ গুণভূষণে ভূষিত করিতে হয়, এ ব্রত যথোপযুক্ত রূপে পালন করিতে হইলে কতখানি উচ্চ জ্ঞান, কত খানি উন্নত চরিত্র, কতখানি ধৈর্য্য ক্ষমা, কত খানি উদারতা ও কতখানি বিমল নিঃস্বার্থ প্রেমের প্রয়োজন,তাহা বিশ্ব-প্রেম-তরঙ্গে তরঙ্গিত হৃদয় বিশ্বসেবক সন্ন্যাসী ও মহাত্মাগণের জীবনচরিতে কথঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে জ্ঞান জগতের নিকট সুজ্ঞান নামে অভিহিত হইবার যোগ্য, যে জ্ঞান প্রকৃতির প্রত্যেক রাজ্য খণ্ডে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে, যে জ্ঞান অনন্ত আকাশে বিলম্বিত অসীম বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সকলের মূলে মূল শক্তিকে দেখিয়া তাঁহার প্রেমে অনুরঞ্জিত হইতেছে, যে জ্ঞান বর্ত্তমান জ্ঞানের সীমান্তপ্রদেশে পৌঁছিয়াও আবার বিশ্বসেবার জন্য নূতন ২ জ্ঞানের বিষয় আবিষ্কার করিবার জন্য লালায়িত, সেই বিশাল জ্ঞান বিশ্বসেবার উপযুক্ত। যে প্রেম ছোট বড় ভাল মন্দ সকলকেই ভালবাসিতে শিখিয়াছে,যে প্রেমের নিকট কীটানুকীটও পরিত্যাজ্য নয়, যে প্রেম বিশ্বময় আপনার ভালবাসা স্থাপন করিয়া সকলের মঙ্গল কামনায় নিজের মনস্তত্ত্ব উদারতা ও প্রশস্ততা সাধনে নিরত তৎপর, সেই প্রেম বিশ্বসেবার উপযোগী ক্ষত বিক্ষত অঙ্গে রুধিরধারা মুছিতে ২ যে হৃদয় বলিয়াছিল "অরে মেরেছিস আমায় কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দেব না ?" সেই হৃদয় আর যে হৃদয় যে সময়ে ভয়ানক ক্রুশে বিদ্ধ শরীর-নিঃসৃত শোণিতে ধরাতল সিক্ত হইতেছিল, যে সময়কার অসহনীয় কষ্টে প্রাণের চির প্রিয়তম ঈশ্বরের দয়ার প্রতিও একটু খানি অবিশ্বাসের ছায়া আসিয়া পড়িতেছিল সে সময়েও বলিয়াছিল "পিতা ! এদের প্রতি ক্ষমা কর।" সেই হৃদয় বিশ্বসেবার প্রকৃত আদর্শ স্থল সন্দেহ নাই। নিঃস্বার্থ প্রেম এ জগতে এক অতুল্য অমূল্য পদার্থ। যিনি বিশ্ব শক্তির প্রতিই

কি, আর বিশ্বের প্রতিই কি নিঃস্বার্থ প্রেম স্থাপন করিতে পারিয়াছেন তিনি দেবতা, তাঁহার হৃদয় চির আনন্দের আগার, তাঁহাকে কখনও তিলমাত্র মনস্তাপ কি পরিতাপ প্রাপ্ত হইতে হইবে না। সমস্ত অনিত্য বিষয়ে নিস্পৃহতাই সুখ। যাঁহাদের ঈশ্বরের প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেম নাই, কি নর নারীর প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেম নাই, তাঁহাদের হৃদয়ে প্রীতির সহিত স্পৃহা রহিয়া যায়, সুতরাং তাঁহারা কখনও অনাবিল সুখে সুখী হইতে পারেন না। যিনি কখনও নিঃস্বার্থ প্রীতির সুধাময় ভাবের আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন তিনিই জানেন ইহা কি পদার্থ!!। নিঃস্বার্থ প্রীতির সহিত যেন অতুলন আনন্দ, চিরশান্তি, অনন্ত সুখ মিশ্রিত রহিয়াছে; এহেন অমূল্য রত্নে যিনি হৃদয় বিভূষিত করিয়াছেন তিনিই বিশ্বসেবার যথার্থ উপযুক্ত পাত্র। যে ধৈর্য্য—সহস্র সহস্র লোকের মধ্য দিয়া বন্ধন করিয়া লইয়া গেলেও অপমানিত এবং এক বিন্দু বিচলিত হয় না, যে ধৈর্য্য—দুঃখ কষ্ট ভয়ের আগার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেও বিশ্বসেবকের মুখের সাহসের ও শান্তির সু-প্রসন্ন জ্যোতি ম্লান হইতে দেয় না, যে ধৈর্য্য—ঘাতকের ভয়াবহ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, মুখের ঘৃণাকর ভীষণ ভাব, জীবনলীলা সমাপ্তকারী তীক্ষ্ণ তরবারী দৃষ্টেও আপনার চির সহবাসী শান্তিকে লইয়া স্বস্থান পরিত্যাগ করে না, সেই ধৈর্য্যই বিশ্বসেবা মহাব্রত পালনে সম্যক্ প্রকারে সমর্থ। যে চরিত্র—দেবতার ন্যায় সকলের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে, যে চরিত্র—মহাপাপে নিমগ্ন মহাপাতকীরও অন্তরে অন্যায় অসত্যে ঘৃণা জন্মাইয়া ভয়ানক অনুতাপাগ্নি জ্বালাইয়া দেয়, যে চরিত্রের অনুকরণে সহস্র সহস্র নর নারীর হৃদয় মনের উন্নতির চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়—সেই চরিত্র, আর যে উদার হৃদয় আপনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র থাকিয়াও অন্যায় অধর্ম্মে চিরদিন অন্তরের অন্তরে ঘৃণা পোষণ করিয়াও অন্যায় অধর্ম্মাচারী দুষ্কর্ম্মান্বিত ব্যক্তিগণকে উদার চক্ষে দর্শন করিতে পারেন, সেই উদারতা বিশ্বসেবকের জন্য একান্ত প্রার্থনীয়। তাই বলিতেছিলাম যিনি বিশ্বসেবাব্রতের সহকারিণী হইবেন, তিনি কেমন স্ত্রীলোক! যিনি অশিক্ষার অন্ধকারে স্থূল স্থূল বিষয় ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না, যিনি কুশিক্ষার অস্বাস্থ্যকর বায়ু সেবনে আপনার হৃদয়ের গঠন ও ভাব ও শোণিত বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন, যিনি সু-জ্ঞান ও সত্য ধর্ম্মের সমুজ্জ্বল জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হইতে পারেন নাই, তিনি কেমন করিয়া বিশ্বসেবার সহকারিণী হইবেন? যাঁহার প্রেম অতিমাত্র সংকীর্ণ স্থান অধিকার করিয়া থাকে, যাঁহার প্রেম কেবলমাত্র হৃদয়ের অনুরাগভাজন স্বামী ও সন্তানগণের মঙ্গলকামনায় পরিসমাপ্ত হয়, যাঁহার প্রেম চতুঃপ্রাচীরের অভ্যন্তর ব্যতীত আর একটু প্রসরতা লাভ করিতে পারে নাই, তিনি কেমন করিয়া বিশ্ব-

সেবার সহকারিণী হইবেন। যিনি, ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির ও কাতর দীন দরিদ্রের কাকুতি মিনতি শ্রবণ করিতে করিতে নিজের মুখে অন্ন তুলিতে পারেন, যিনি জীবিকার উপায়হীন দুর্দ্দশাগ্রস্ত দুঃখীর শীতে প্রপীড়িত অভাগা সন্তানগণের দুঃখের কথা না ভাবিয়া আপনার সন্তান সন্ততিকে বহুমূল্য বস্ত্র অলঙ্কারে সাজাইতে পারেন, যিনি দুর্ভিক্ষে কোন দেশ উৎসন্ন যাইতেছে শুনিয়াও নিজের গৃহ সজ্জা ও ভূষণভার পরিত্যাগ করিতে পারেন না, তিনি কেমন করিয়া বিশ্বসেবার সহকারিণী হইবেন? যিনি দাস দাসী কিম্বা সন্তানগণের সামান্য বিরক্তিকর কার্য্যেই একবারে অধৈর্য্য ও অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়েন, যিনি লোকের সামান্য নিন্দাবাদ বা অপমানও সহ্য ও অগ্রাহ্য করিতে পারেন না, যিনি একটী সামান্য পার্থিব বাসনাও চরিতার্থ না হইলে আপনার মনের শান্তি রক্ষা করিতে পারেন না, তিনি কেমন করিয়া বিশ্বসেবার সহকারিণী হইবেন? যাঁহার জ্যোতির্ম্ময় অত্যুজ্জ্বল চরিত্রের প্রভা দর্শনে মহাপাতকী নর নারীর মর্ম্মে প্রীতি ও অন্তরে ভীতি সঞ্চারিত না হয়, যাঁহার অকলঙ্ক চরিত্রের অনুকরণে লক্ষ লক্ষ নর নারীর হৃদয়ে সুনীতির বীজ রোপিত হইয়া সুফল প্রসবে সমর্থ না হইতে পারে, তিনি কেমন করিয়া বিশ্বসেবার সহকারিণী হইবেন! হে শ্রদ্ধাভাজন বিশ্ব সেবা ব্রতধারী? তুমি প্রথমে সহকারিণী স্ত্রীলোককে জ্ঞান ধর্ম্মে অলঙ্কৃতা হইতে দাও, তৎপরে উপযুক্তা দেখিলে তোমার সহকারিতা পদে অভিষিক্ত কর; নতুবা বিফলমনোরথ হইতে হইবে সন্দেহ নাই। (ক্রমশঃ)

বাঙ্গালা প্রবচন।*

(২৬৫ সংখ্যা ৩১৫ পৃষ্ঠার পর)

দ

১। দয়ার চেয়ে ধর্ম্ম নাই,
হিংসার চেয়ে পাপ নাই।

২। দরদী বিনা দরদ বোঝে না।

৩। দর্পণে মুখ দেখা।

৪। দর্পহারী ভগবান্।

৫। দশচক্রে ভগবান্ ভূত।

৬। দশের লাঠী একের বোঝা।

৭। দশে মিলে করি কাজ,
হারি জিতি নাই লাজ।

* ১২৯৩ সালের বামাবোধিনীতে অ হইতে থ পর্য্যন্ত আদ্যক্ষরযুক্ত প্রবচন প্রকাশিত হয়। পরে কোন কারণে অনাবশ্যক বিবেচনায় প্রচারে ক্ষান্ত হওয়া যায়। এখন কোন কোন বন্ধুর বিশেষ অনুরোধে আমদের সংগৃহীত প্রবচনের অবশিষ্ট গুলি প্রকাশ করিতেছি, আশা করি পাঠক পাঠিকার নিকট অপ্রীতিকর হইবে না। বা, বো, স।

৮। দাতার খেয়ে বখিল ভাগ।

৯। দাতার চেয়ে বখিল ভাল
ত্বরিত জবাব দেয়।

১০। দাতা বই প্রাজ্ঞ নাই,
দিলী বই ডাল নাই।

১১। দানের উচিত পাত্র দরিদ্র দুর্ব্বল,
ধনীকে করিলে দান নাই তত ফল।

১২। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্য্যাদা
জানা যায় না।

১৩। দিন গেলে ক্ষণ যায় না।

১৪। দু নৌকায় পা দেওয়া।

১৫। দুঃখ বিনা সুখ হয় না।

১৬। দুঃখের অন্ন সুখ করে খাওয়া।

১৭। দুধ দিয়ে কাল সাপ পোষা।

১৮। দুধের তৃষ্ণা ঘোলে মিটে না।

১৯। দুর্জ্জনেরে পরিহরি,
দূরে থেকে নমস্কার করি।

২০। দুর্ব্বলস্য বলং রাজা।

২১। দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য
গোয়াল ভাল।

২২। দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথা ঘনায়ে
বসে কাছে,
কথা দিয়ে কথা নেয়,
প্রাণ বধে পাছে।

২৩। দেখ্‌ছি কত দেখ্‌ব আর,
ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার।

২৪। দেখতে পেলে কে শুনতে চায়?

২৫। দেখে শেখে আর ঠেকে শেখে।

২৬। দেনার চেয়ে পাপ নাই।

২৭। দেবতার খেলা লীলা খেলা,
পাপ লিখেছে মানুষের বেলা।

২৮। দেবো ধন, বুঝবো মন,
হরে নিতে কত ক্ষণ?

২৯। দৈ খাবে মেদো,
কড়ী দেবে সেদো।

৩০। দৈত্যের হাসি।

৩১। দৈত্য কুলে প্রহ্লাদ।

৩২। দো মিলে ভেড়া মারে।

সতী ও শান্তি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্রাদ্ধ বাড়ীতে আজ্ কুটুম্বের মেয়ে ধরে না। মাসী, পিসী ভাইঝী, বোনঝী, মামী, মামাশাশুড়ী, শাশুড়ী, দিদিশাশুড়ী দিদি শাশুড়ীর গঙ্গাজলের বোনঝীর মেয়ে, বড় পিসীর মামাত ভগিনীর খুড়্ শাশুড়ীর ছোট বোনের বকুলফুল এইরূপ দূর, অদূর, পরিচিতা অপরিচিতা বালিকা যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, জরাগ্রস্তা-এইরূপ নানাবর্ণের, নানা আকৃতির, নানা প্রকৃতির বহুসংখ্যক রমণী আজ্ একত্রিতা। শ্রাদ্ধ বাড়ীটিকে আজ্ "হাটের পুরী" বলিলেও বলা যাইতে পারে। খেয়ে—নেয়ে—থায়ে—গেলোরে—মলোরে—পালারে কেবল এই রব। বাটির গৃহিণী আসিয়া কোন স্ত্রীলোককে বলিতেছেন "এ কিরণের মা, তুমি না তোমার ছোট

ছেলেটিকে একটু দুধ খাওয়াও; তোমার মেয়ে দুটী গেল কোথা, তাহাদের কি খিদে লাগে নি? ও চন্দনের মা, চন্দনের মা, এদিকে আয় মা এদিকে আয়; মাছ ক'খানা কুটে আন্ মা।" চন্দনের মার ওদিকে মহা বিভ্রাট উপস্থিত। গুড়ের শামুকটি হারাইয়াছে, কাজে মন লাগে কি? ভারি কষ্ট। এদিকে চন্দন আর কেষ্ট দুজনে মাছের পট্কা নিয়ে মহা গণ্ডগোল বাধাইয়াছে। ওদিকে বিলেসদিদির নাতিনীটিকে ডাইনে খাইয়াছে, সে দুধ্ তোলাইতেছে, অতএব তাহার জন্য ডাইন ছাড়ান ওঝা ডাকার বন্দোবস্ত হইতেছে।

আজ আবার পৌষ সংক্রান্তি। বড়পিসী পিঠে ভাজিতেছেন, রামদাদার ছেলে দাঁড়াইয়া পিটে ভাজা দেখিতেছে, হঠাৎ তার কি কুমতি হইল, সে বলিয়া ফেলিল ঠাকু মা, কড়ায় তেল ঢেলে দেবো?" ঠাকুর মা অমনি তেলে বেগুণে জলিয়া উঠিলেন, মারিতে তাড়া করিলেন, বলিলেন, সর্ব্বনেশে, মুকপোড়া, লক্ষীছাড়া, কি করিলি, সর্ব্বনাশ করিলি, সব পিটে কাঁচা থাকবে। এই বলিয়া যেমন মারতে তাড়া করিলেন, অমনি উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়। কিয়দ্দূর গিয়া এমন একটি আছাড় খাইল, যে তাহাতে বেচারীর সম্মুখের দুটী দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল। বলা বাহুল্য যে বড়পিসী বহুকাল হইতে হৃদয়ে একটি কুসংস্কার পোষণ করিয়া আসিতেছেন, যে পিটে ভাজার সময়ে তেলকে তেল বলা উচিত নয়, জল বলা উচিত। তাহা না হইলে পিটে কাঁচা থাকে। তাই আজ রামদাদার ছেলের এই নিগ্রহ। অনেকগুলি মেয়ে তাহাকে ঘিরিয়া কেহ বলিতেছেন, মাথায় জল দাও, কেহ বলিতেছেন, "বাতাস কর", কেহ বলিতেছেন হায় হায়, ছেলে আর নাই! মদন ডাক্তারকে ডাক। এই লইয়া সেখানে একটা মহা গণ্ডগোল। মহামারী কাণ্ড। এদিকে আবার আর এক জায়গায় পিটে ভাজা হইতেছে। এখানে ঠাকুরমার গঙ্গাজল মুখ ভার করিয়া কি বিড়বিড় বিড়বিড় করিতেছেন। কাছে গিধিরাম নামক একটি ছেলে দাঁড়াইয়া ছিল, ঠাকুরমারে গঙ্গাজল তাহাকে বলিলেন, দেখ্তো ভাই একখানা পিটে চেখে, ভেতরে কাঁচা আছে কি না? নিধিরাম ভাঙ্গিয়া বলিল, "হ্যা গো দিদি, ভেতরে আস্তো কাঁচা।" তাই তিনি বিড়বিড় বিড়বিড় করিয়া বলিতেছেন এ ঠিক্ পদীর কাজ্। পদী পাশের বাড়ীর ঝি। সে আজ্ কার্য্যার্থে নিমন্ত্রিতা। পাড়ার মেয়েদের বিশ্বাস পদী ডাইনী। সে ডাইন্-মন্ত্র জানে, ঠাকুরমার গঙ্গাজল মেয়েদের মুখে কথা-প্রসঙ্গে আগে এ সংবাদ রাখিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ আগে পদীর সঙ্গে ঠাকুরমার গঙ্গাজলের "গুড়ের শামুক" লইয়া কি সামান্য একটা ঘটনা হয়। তাহাতে তাঁহার মনে সন্দেহ কেন

একবারেই তিনি ঠিক করিয়াছেন যে পদী মন্ত্রদ্বারা পিঠে "ভেরেছে"। তাই তিনি বলিতেছিলেন "এ ঠিক্ পদীর কাজ।" পদীর কাজ, পদীকে ডাক্ পড়িল। পদী আসিল, ঠাকুর মার গঙ্গাজল তাহাকে বলিলেন, "কেমন্‌রে সদীর বেটী পদী, তুই পিঠে ভেরেছিস্ কেন? এখনি যদি "কাটান-মন্তর" দিস্ তো ভাল, তা না হলে তোর ভাল হবে না বল্‌চি।" পদী একেবারে হতভম্ব, এত মেয়ের মাঝখানে তাহাকে এই কথা! এ অপমান আর তাহার সহ্য হইল না। সে কাঁদিয়া ফেলিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে পাশের একটি মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, মা, আমার কোনও পুরুষে মন্তর তন্তর জানে না, আজ কিনা ইনি আমাকে দাগা দিতে চান। পাশের মেয়েটি বলিলেন, "আঃ, দেনা মা কাটান মন্তরটা; এমন সময় কি আর ওরকম করা ভাল? নয় উনি "গুলের শামুকের" জন্যে তোকে দুকথা বলেছেন, তা ব'লে কি আর পিঠে "ভাব্‌তে হয়?" পদী আর একটি মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি ও সব মন্তর তন্তর, মনে জ্ঞানে জানি নি, মা।" পাশের মেয়েটি বলিলেন, "বাতাসটি না হ'লে কি পাতাটি নড়ে বাছা? তুই ওসব না জান্‌লে কি আর লোকে মিছে কথা বলে?" পদীর আর দাঁড়াইবার স্থল নাই। যাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া দুকথা বলিবার চেষ্টা করে, তিনি মুখ বাঁকাইয়া তাহার সহিত সহানুভূতি করিতে নারাজ হন। সুতরাং এখন উপায় কি? এখানে মেয়েদের আদি ভিড়, দেখিয়া এবং গোলমাল শুনিয়া, কি ব্যাপার জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া, তথায় শান্তি আসিলেন। আসিয়া ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হয়েছে, ঠাকুর মা?" ঠাকুর মা বলিলেন, "ঐ সদীর বেটি পদী পিঠে ভেরেছে।" এই কথা শুনিয়া শান্তি ঈষৎ হাস্য করিলেন। কিন্তু পদীর মুখের দিকে তাকাইতে শান্তির সেই মৃদু হাস্যটুকু যেন ফুট্‌তে ফুট্‌তে শুকিয়ে গেল। তিনি বলিলেন, "কৈ দেখি কি হ'য়েছে?" এই বলিয়া একখানি ফুলরি লইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। দেখিলেন ভিতরে কাঁচা রহিয়াছে। কেন কাঁচা রহিয়াছে, তিনি বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "তোমরা সকলে পদ্মকে দোষ দিচ্ছ, আর তোমাদের এই যে গলদ্ রয়েছে? কলা যে বেশী পড়েছে। তাই ভিতরে কাঁচা থাক্‌ছে।" এই বলিয়া তিনি কিছু আটা মিশাইয়া দিলেন। ঠাকুরমার গঙ্গাজলকে বলিলেন, "এবার ভাজ দেখি"। তিনি ভাজিলেন আর কাঁচা রহিল না। সব ঠিক্ হইয়া গেল। তিনি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। এদিকে মেয়ে মহলে খুব একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল, "শান্তি যা হ'ক ধন্যি মেয়ে!" কেহ বলিলেন, আর সীতে, ধন্যি হবে

না কেন ? "কালীর আকরের" এমনি রূপ! কেহ বলিতে লাগিলেন, শাস্তি ভূত, পেরেত, বেহ্মদত্যি, ডাকিনী, শাঁকিনী এ সব কিছু মানে না—ডা'ন মন্তর—ভূতছাড়ান মন্তর, বাণ মারা মন্তর, বাটিচালা, ডাইনে খাওয়া, ভূতে পাওয়া এসব কিছুই বিশ্বাস করে না।" বিলেসের মা বলিলেন, "আমাদের বেশর ঐ রকম। সে বলে ভূত নেই, পেরেত নেই, মন্তর টন্তর কিছু নয়, ওসব লোকা লোককে ঠকিয়ে পয়সা নেবার কল।"

টৌডাজাতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

টৌডাজাতি নীলগিরি পর্ব্বতে বাস করে। কথিত আছে ইহারা মহিসুর প্রদেশ হইতে আসিয়া এখানে বাস স্থাপন করে। পশুচারণই ইহাদের ব্যবসায়। ইহারা এপর্য্যন্ত কাহারও দাসত্ব স্বীকার করে নাই। ইহাদের বাসস্থান ও বাসগৃহ দেখিতে পরিষ্কার ও রমণীয়। যে স্থানে বৃক্ষ ও নিকটে নির্ঝর আছে, এরূপ স্থানে ইহারা গৃহ নির্ম্মাণ করে। মহিষ পালন করাই ইহাদের কার্য্য এবং ইহারা মহিষের দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

টৌডাজাতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অতি অদ্ভুত ব্যাপার। ইহা দুইবার হইয়া থাকে। প্রথম অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া মৃত্যুর তৃতীয় দিবসে হইয়া থাকে। শবদেহ খাটিয়াতে করিয়া শ্মশানে বাদ্যগীত সহকারে লইয়া যাওয়া হয়। ঐ স্থানে তৃণ পল্লব নির্ম্মিত একটী নূতন কুটীরে শবদেহ প্রথমে স্থাপন করিয়া আত্মীয়গণ ক্রন্দন করিতে থাকে। শবকে নূতন বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া তাহার পদদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ লালবর্ণ সূত্র দ্বারা বন্ধন করা হয় এবং চারিটী যষ্টিতে কপর্দ্দক (কড়ী) বন্ধন করিয়া ঐ যষ্টিগুলি তাহার গাত্রে স্থাপিত করা হয়। তদনন্তর মৃতদেহ কুটীরের বাহিরে আনয়ন করা হয় এবং তাহার নিকটে একটী চক্র নির্ম্মাণ করা হয়। পরে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়গণ আপনাদের মস্তক আবৃত করিয়া ঐ চক্রের বাহিরে এক গাছি বেত্র দ্বারা মৃত্তিকা খনন করে এবং তিন মুষ্টি মৃত্তিকা ঐ চক্রের মধ্যে এবং তিন মুষ্টি মৃতদেহে নিক্ষেপ করিতে থাকে। এই ক্রিয়াটী শেষ হইলে মৃত দেহকে পুনর্ব্বার ঐ কুটীরে লইয়া যাওয়া হয়। তদনন্তর মৃত ব্যক্তির মহিষ সকল ঐ কুটীরের সম্মুখে আনয়ন করা হয় এবং তন্মধ্যে দুইটী জন্তুকে বাদ্যভাণ্ড সহকারে ঐ কুটীর মধ্যে লইয়া যাওয়া হয়। অনন্তর মৃত দেহকে তিনবার ঐ মহিষদ্বয়ের নিকট উত্থিত করিলে পর তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ নির্দ্দয়রূপে বধ করা হয়। পরে যখন মৃত মহিষদেহ শবদেহের উভয় পার্শ্বে রাখিয়া

মৃত ব্যক্তির প্রত্যেক হস্ত প্রত্যেক মহিষের এক একটী শৃঙ্গের উপর রাখা হয়, তখন তাহার আত্মীয়গণ পরস্পরের হস্ত ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে থাকে। ইতিমধ্যে চিতাগ্নি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহারা গৃহ হইতে অগ্নি আনয়ন করে না, কিন্তু দুই খণ্ড কাষ্ঠ পরস্পর সংঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি প্রস্তুত করে। চিতাগ্নি প্রজ্বলিত হইলে পর মৃত ব্যক্তির বস্ত্রে কিঞ্চিৎ শস্য, গুড় এবং পয়সা বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে তিনবার চিতাগ্নি স্পর্শ করাইয়া অধোমুখ করত চিতাতে নিক্ষেপ করে। চিতাশায়ী করিবার পূর্ব্বে মৃত ব্যক্তির মস্তক হইতে কেশ এবং এক খণ্ড অস্থি এবং একটী নখ কাটিয়া লওয়া হয়। এই কয়েকটী মৃত দেহাংশ লইয়া কিয়দ্দিবস পরে পুনর্ব্বার দ্বিতীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই সময়েও মহিষ বধ করা হইয়া থাকে। এই ব্যাপার দেখিবার জন্য নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে লোকের জনতা হয়, বোধ হয় যেন একটী মেলা হইতেছে। মহিষগুলি আনয়ন করিলে পর মৃত ব্যক্তির আত্মীয়েরা ও অপরাপর লোকেরাও তাহাদিগের সহিত মল্লযুদ্ধ আরম্ভ করে এবং মহিষগুলিকে ক্রমে ক্রমে বধ করে। পরে প্রথম অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় মৃত দেহের যে সমস্ত অংশ রক্ষা করা হইয়াছিল, তাহা নূতন বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া শ্মশান ভূমিতে আনয়ন করা হয়। প্রথমবারের ন্যায় এবারও প্রস্তর দ্বারা একটী চক্র নির্ম্মাণ এবং ঐ চক্রের বাহিরে একটী গহ্বর খনন করা হয়। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়েরা ঐ গহ্বর হইতে মৃত্তিকা লইয়া তিন মুষ্টি ঐ মৃতাবশেষের উপর এবং তিন মুষ্টি ঐ চক্রের মধ্যে নিক্ষেপ করিলে পর ঐ দেহাবশেষ ও তাহার সঙ্গে বিবিধ খাদ্য সামগ্রী, রৌপ্য মুদ্রা, এবং কুড়ুল, ধনুক, তীর ছুরি, ছাতা প্রভৃতি ব্যবহার্য্য বস্তু ঐ চক্রের মধ্যে ভস্মসাৎ করা হয়।

কৃষি তত্ত্ব।

ভূমির সার।

যে বস্তু মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইলে মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়, তাহাকে সার বলা যায়। ধাতু, উদ্ভিদ, জন্তু ইত্যাদি নানাবিধ বস্তু বিকৃত হইয়া সাররূপে পরিণত হয়, এই নিমিত্ত সার নানা প্রকার।

উদ্ভিদবেত্তা হিয়ং সাহেব সারের বিষয় এইরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লিখিয়াছেন। যথা—

১ম—সারের প্রকৃতি।

২য়—তাহার গুণ।

৩য়—তাহার সংগ্রহ।

৪র্থ—তাহার প্রস্তুত করণ।

৫ম—ভূমির অবস্থা প্রভেদে প্রয়োগ।

৬ষ্ঠ—প্রয়োগ বিধি।

৭ম—প্রয়োগের কাল নির্ণয়।

৮ম—প্রয়োগের পরিমাণ নির্ণয়।

৯ম—প্রয়োগের ভূমি নির্ণয়।

পরে তিনি সারকে দুই প্রকারে ভাগ করিয়াছেন, প্রথমতঃ যাহা ক্ষেত্রের মৃত্তিকা খুঁড়িয়া তোলা অথবা ক্ষেত্রের মৃত্তিকার উপর প্রস্তুত করা যায়; দ্বিতীয়তঃ, যাহা ভিন্ন স্থান হইতে আনীত হয়। এই দ্বিতীয় প্রকারকে পুনরায় তিন প্রকারে বিভাগ করিয়াছেন, যথা—জৈব, উদ্ভিদ ও খনিজ। যে সকল সার মৃত্তিকা হইতে খুঁড়িয়া পাওয়া যায়, তাহা ধাত্বংশ মৃত্তিকা, কর্দ্দম ও মাটি।

ধাত্বংশ মৃত্তিকা—কর্দ্দম, প্রস্তর ও কড়ির মাটি এই কয় পদার্থে সংসৃষ্ট। ধাত্বংশ মৃত্তিকা ইংলণ্ড প্রদেশে সচরাচর পাওয়া যায়। শুক্ল, লোহিত, নীল, কালীয় প্রভৃতি বর্ণের দ্বারা ইহাদের পরস্পরের প্রভেদ জানা যায়। কিন্তু ঐ সকল বর্ণের প্রতি লক্ষ্য করিবার আর কোন আবশ্যকতা নাই, তাহার দ্বারা শুদ্ধ লৌহের অংশ নির্ণয় করা যাইতে পারে।

ঐ সমস্ত মৃত্তিকা প্রায়ই বালুকা, কর্দ্দম ও ধাতু মিশ্রিত মাটিতে উৎপন্ন হয়। যে সকল মৃত্তিকার বর্ণ লোহিত এবং কালীয়, তাহাতে লৌহের ভাগ অতি অল্প। চে সায়ারের কোন স্থানের মৃত্তিকাতে শতকরা ১০০ পরিমাণে লৌহ ছিল।

ধাতু মিশ্রিত মাটিতে শতকরা ২৫ অবধি ৮০ পর্য্যন্ত লৌহাংশ থাকে। কোন উৎকৃষ্ট কর্দ্দম মাটিতে, ধাতু মিশ্রিত মাটির ভাগ ৪০, কর্দ্দমের ৫০ ও বালুকার ৮ হইতে ১০ দেখা গিয়াছিল, এবং শারীরিক সকল দ্রব্যের বিনাশ হইলেও অঙ্গার বায়ু থাকে। সকল ধাতু মিশ্রিত মাটি হইতে ফসফোরস্ পাওয়া যায়।

যে মৃত্তিকা ধাতু মিশ্রিত, তাহা অত্যন্ত মূল্যবান; কিন্তু কোন্ মৃত্তিকাতে কত পরিমাণে ধাতু মিশ্রিত থাকা উচিত, তাহা অদ্যাপি জানা নাই। এই সকল বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী ব্যক্তিরা নানা প্রকার সারের পরীক্ষা করিয়াছেন, এবং তাহার মধ্যে যে সকল উৎকৃষ্টতম বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে, তাহাতে শতকরা ২ অবধি ৩০ পর্য্যন্ত লক্ষিত হইয়াছে। ইয়ং সাহেব অনেক অত্যুর্ব্বরা মৃত্তিকার পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনিও ৯ অবধি ২০ পর্য্যন্ত ধাত্বংশ দেখিয়াছেন। কিন্তু অনেক অকর্ম্মণ্য মৃত্তিকাতেও উর্ব্বরা মৃত্তিকার সমান পরিমাণে ধাতু মিশ্রিত মাটি থাকে, তাহাতে তিনি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে মৃত্তিকায় শারীরিক দ্রব্যের যে অংশ পরিবর্ত্তিত হইয়া অঙ্গারবায়ুকে পরিণত হইতে পারে, তাহার যে পরিমাণে অভাব থাকিবে, সেই পরিমাণে অধিক ধাতু মিশ্রিত মাটি থাকা আবশ্যক,

অর্থাৎ তাহা হইলে উর্ব্বরতা সাধন হয়। যদি কোন কৃষক পরীক্ষা দ্বারা কিম্বা অন্য প্রকারে এমন জানিতে পারেন, যে তাঁহার ক্ষেত্রে অতি অল্প ঐ শারীরিক পদার্থ আছে, তাহা হইলে তাহাতে শতকরা ২০ অংশ ধাতু মিশ্রিত মাটী যোগ করা উচিত। কিন্তু যদি শারীরিক পদার্থ যথেষ্ট থাকে, তাহা হইলে ধাত্বংশ মৃত্তিকায় ক্ষেত্র আঠালিয়া ও কঠিন করে, এই প্রকার ক্ষেত্রে কর্দ্দম মৃত্তিকার সংযোগ উত্তম কল্প। কোন কোন মৃত্তিকাতে অম্লের (Acid) অণু সকল থাকে, ইহাতে অপকারের সম্ভাবনা। ধাতু মিশ্রিত মাটির দ্বারা ঐ অম্লের দোষ বিনষ্ট হয়।

উদ্ভিজ্জে যে মাটী দৃষ্ট হয়, তাহার অধিকাংশই ধাতুমিশ্রিত, এই কারণে বোধ হয় যে ঐ মাটীতে সার হয়।

ধাত্বংশ মৃত্তিকা সচরাচর খুঁড়িয়া পাওয়া যায়, এবং নদীর খাড়ি হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। শুভ্রবর্ণ কড়ির মাটী এবং আর এক প্রকার পাতলা শুভ্র জাতীয় পঙ্কের ভিতর এবং বিলের তলা হইতে পাওয়া যায়। যেস্থলে এই মাটী থাকে, যদি তাহার উপরিভাগ হইতে তাহা প্রতীত না হয়, তাহা হইলে সেই স্থান বিদ্ধ করিয়া নীচে হইতে মাটী তুলিয়া পরীক্ষা করা উচিত।

এই মাটীতে কিছু পাট করিতে হয় না, কেবল ছড়াইয়া দিলেই হয়, এবং যত অধিক দিন পরে তাহার উপর হল প্রচালিত হয়, ততই ভাল। মটরের চাষ অগভীর হইলে উত্তম, শালগমের পক্ষে কিঞ্চিৎ মন্দ। এই মাটী যে মাঠে দেওয়া হয়, তাহার উপর গোল আলুর ফসল প্রথমবার উত্তম হয় না। যে জমীতে পূর্ব্বে চাষ হইয়াছিল, তাহাতেও এই মাটী দিলে উত্তম হয়। এই সকল দিবার সময় কৃষক বিবেচনা করিবেন, যদি ক্ষেত্র আর্দ্র হয়, তাহা হইলে গ্রীষ্মকালে এবং যদি ক্ষেত্র শুষ্ক হয়, তাহা হইলে শীতকালে দিবেন।

সার কি পরিমাণে দিতে হইবে, এবিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করা আবশ্যক। যদি অনুর্ব্বর বলিয়া মাটীর উপর অধিক পরিমাণে দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে জমি অনেক কালের জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, কিন্তু অল্প পরিমাণে দিলে বিশেষ উপকারিতা আছে। এই সার বরং দুইবার করিয়া দেওয়া ভাল, তথাচ একবারে অধিক দেওয়া কিছু নয়। অনুর্ব্বর কর্দ্দম অথবা ফশকা মাটীতে অধিক পরিমাণে দিলে হানি হয় না।

জাপানে ভূমিকম্প।

গত অক্টোবর মাসের শেষে জাপানে ভূমিকম্প হইয়া ভয়ানক কাণ্ড ঘটিয়াছে।* প্রায় ৩১টী জেলা ব্যাপিয়া ভূমিকম্প হয়, তাহাতে অনেক লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ইজোজি, মিনো এবং ওয়ারি জেলায় ৩৪০০ ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে, ৪৩০০০বাটী ভূমিসাৎ হইয়াছে এবং অনেক নগর ও গ্রাম ধ্বংস হইয়াছে। গিফু নগরে ভূমিকম্পের সময় দুই খানি রেলের গাড়ী তত্রত্য ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হয়। আরোহীরা শকট মধ্যে বিষম ক্লেশ সহ্য করে। রেলপথ কেবল দোলে নাই, স্থানে স্থানে একেবারে স্খলিত হইয়া ভয়ঙ্কর গহ্বর সকল উৎপন্ন হইয়াছে, তন্মধ্য হইতে প্রভূত পরিমাণে উষ্ণ জল ও ধাতব পদার্থ সকল নির্গত হইয়া নিকটস্থ জনগণের বিপদের কারণ হইয়াছে। আরোহীরা শকট হইতে নামিয়া কে যে কোথায় যাইবেন স্থির করিতে পারেন নাই। একজন প্রত্যক্ষদর্শী লিখিয়াছেন যে গিফু নগরের প্রায় সমস্ত প্রকাণ্ড অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইয়াছে, অসংখ্য প্রাণী বিনষ্ট হইয়াছে। নগরের চতুর্দ্দিকে অনেক স্থল জলে পরিণত হইয়াছে এবং রাত্রিতে সহসা অগ্নি কাণ্ড হইয়া অবশিষ্ট গৃহ সকল ভস্ম করিয়াছে। অগ্নি পর দিন পর্য্যন্ত প্রজ্বলিত থাকিয়া ভীষণ কাণ্ড সম্পূর্ণ করিয়াছিল। গবো নগরে একটী বৌদ্ধ মন্দির উপাসনার সময় একবারে বসিয়া যায় এবং পঞ্চাশৎ উপাসক তৎসঙ্গে প্রোথিত হন। ২৬এ অক্টোবর প্রাতঃকালে একটী স্কুলবাটী পতিত হইয়া আশ্রিত অনেক লোকের মৃত্যু সংঘটন করে; পতিত গৃহ চাপে পথ ঘাট সকল একবারে বন্ধ হইয়াছিল এবং পথিকদিগের ভিড়েও অল্প ব্যক্তির মৃত্যু হয় নাই। একটী সূতার কল বিনষ্ট হইয়া শত শত লোকের প্রাণ নষ্ট হইয়াছে। প্রথম (বোধ হয় ২৫শে) হইতে ৩০শে অক্টোবর পর্য্যন্ত অন্যূন ৩৬৮ বার ভূমিকম্প হয়। অনেক স্থলে ২ পাদ বিস্তৃত ও অনেক পাদ গভীর গর্ত্ত সকল উৎপন্ন হইয়াছে। রেলের পথ সকল বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, লৌহ-সেতু ও নদীর পোস্তান বাঁধ সকল একবারে ভাসিয়া গিয়াছে, কোন কোন স্থান সহসা ভূগর্ভে নিহিত হইয়াছে।

গিফু জেলার প্রায় ৩৫০ মাইল নদীর পোস্তান একবারে বিনষ্ট হইয়াছে। অনেক জেলা একবারে শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে, পূর্ব্বকার চিহ্ন মাত্র লক্ষিত হয় না।

হকুসন পর্ব্বতের তলে ৬০০ গজ দীর্ঘ এবং ৬০ গজ প্রস্থ একটী প্রকাণ্ড হ্রদ দেখা দিয়াছে এবং নিকটস্থ স্থান

* ইতিপূর্ব্বে বামাবোধিনীতে আমরা ইহার সংবাদ মাত্র প্রকাশ করিয়াছিলাম, অদ্য তাহার বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে।

সমুদ্রে ভূরি ভূরি গহ্বর উৎপন্ন হইয়াছে, এই সকল গহ্বর হইতে বেগে জল বহির্গত হইয়া নির্ঝর আকার ধারণ করিয়াছে। সমতলের কূপসকল অন্ধ হইয়া গিয়াছে। কোথাও বা কূপোদক ঈষৎ পিঙ্গল বর্ণে বিকৃত ও বিস্বাদ হইয়া পানের অযোগ্য হইয়াছে। গিফু নগরে প্রায় ৭০০ দেবালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল, তৃতীয়াংশেরও অধিক ভূমিসাৎ বা ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়াছে এবং অবশিষ্টের অনেক গুলিও আংশিক ভগ্ন হইয়াছে। নগরের কোন কোন অংশে ভয়ঙ্কর গহ্বর সকল উৎপন্ন হইয়া দুই ঘণ্টারও অধিক কাল ধরিয়া অনবরত উষ্ণ কর্দ্দম স্রোত প্রবাহিত করিয়াছে। পবিত্র ফিউজি-য়ামা পর্ব্বত শিখর বিদীর্ণ হইয়া এক প্রকাণ্ড গহ্বর উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার পরিমাণ ১২০০ পাদ বিস্তৃত ও ৬০০ পাদ গভীর। এপর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রায় ৩০০০০ লোক মৃত, ৯০০০০ গৃহ পতিত এবং ২ লক্ষ মনুষ্য গৃহশূন্য হইয়াছে।

নূতন সংবাদ।

১। গত ১২ই মার্চ্চ বেথুন কলেজের পরিতোষিক বিতরণ অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ছোটলাট পত্নী স্বহস্তে পরিতোষিক বিতরণ করেন এবং ছোটলাট বক্তৃতা করেন। বেথুন বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা ১৪৯, ইহার মধ্যে কলেজের ছাত্রী ২০ জন। প্রাচীন তন্ত্রের হিন্দু গৃহের ছাত্রী ৬০ জন মাত্র আছে, অবশিষ্ট ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান। হিন্দু ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক।

২। ভদ্র হিন্দু বিধবাদিগের ভরণ পোষণের সাহায্যার্থ মহারাজ যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর লক্ষ টাকার সংস্থান করি-য়াছেন, ইহার সুদে ব্যয়নির্ব্বাহ হইবে। মহারাজার বদান্যতাকে ধন্যবাদ।

৩। দাক্ষিণাত্যে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতেছে। হাইদ্রাবাদের নিজাম ও মহীশূর মহারাজা দুর্ভিক্ষ পীড়িতদিগের সাহায্যার্থ বিস্তৃত কার্য্য ক্ষেত্র খুলিয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। জীবন সোপান, প্রথম ভাগ—শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ।/০ মাত্র। শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধন দ্বারা যাহাতে মানবজীবন পূর্ণভাবে সংগঠিত হইতে পারে, গ্রন্থকার এই পুস্তকে তাহারই প্রয়াস পাইয়াছেন। গ্রন্থখানি সুপ্রণা-লীবদ্ধ এবং অনেক গুলি সার সার উপদেশ ও ইঙ্গিতে পূর্ণ। উপদেশের সহিত দৃষ্টান্তও যথেষ্ট আছে। পুস্তকখানি প্রণয়নে গ্রন্থকার আপনার চিন্তাশীলতা ও ভাবগ্রাহিতার সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন। ইহা বিদ্যালয়ের পাঠ্য মধ্যে নিবিষ্ট হইবার যোগ্য।

বামারচনা।

অভিমানে।

অভাগা অধম আমি
জগতে মিলে না ঠাঁই,
কাঁদিব কাহার কাছে!
তুমি তো জগতে নাই। ১

কেউ না আদর করে
কেউ নাহি ভাল বাসে ;
কেঁদে কেঁদে মরে গেলে,
কেউ না হাসাতে আসে।২

নিতি আসে উষা রাণী
নিতি পথ চেয়ে রই,
সবারে মমতা করে,
আমি যেন কেউ নই।৩

উজল তরুণ রবি
সবারে সে দেয় আলো ;
আমি তার "পর পর"
আমারে বাসে না ভাল। ৪

বাতাস সবারি সাথে
করে সোহাগের খেলা,
আমারে গরিব বলি
শুধু ঘৃণা, অবহেলা। ৫

অমৃত জ্যোছনা হাসি
সোণা মুখে হাসে চাঁদ,
চায় না আমারি পানে,
বোঝে না আমারি সাধ! ৬

সরসে মৃদুল ঢেউ
বয়ে যায় তর তর,
ক'য়ে যায় মোরে তারা
"হেথা হতে সর সর"। ৭

কোকিলা, পাপিয়া, শ্যামা,
চাহিলে আমার মুখে,
নিভায় মধুর গীতি
কত শোক যেন বুকে! ৮

বসন্ত শরৎ তারা
আজো আসে পা'য় পা'য়,
তফাতে তফাতে থাকে
পাছে মোরে ছোঁয়া যায়! ৯

সবে চায় রাঙা চোখে
সবে করে "দূর, ছাই"
কাঁদিব কাহার কাছে
তুমি তো জগতে নাই! ১০

সে কালের সাথী গুলি
আর তো আসে না কাছে,
লাগে বা তাদের গা'য়
আমার বাতাস পাছে! ১১

আগে তো মল্লিকা জাতি
দেখা হ'লে দি'ত হাসি,
ফুরায়েছে সে সুদিন
গেছে ভালবাসাবাসি। ১২

আগে ছিল এই বাড়ী
ফুলে ফুলে ফুলময়,
আজি শুধু মরুভূমি
কেমনে পরাণে সয়! ১৩

"আহা" "উহু" দুটি কথা
নাই আর মোর তরে,
নিঠুর পিশাচ-দেশে
থাকিব কেমন করে? ১৪

সেই ছিল—এই ঘর
অলকা অমরাপুরী,
আজি খালি চিতাময়,
শ্মশানে শ্মশানে ঘুরি! ১৫

আগুণ জেলেছে এরা
আমারে করিতে ছাই—
লুকা'ব কাহার কাছে
তুমি তো জগতে নাই! ১৬

সংসারের পদ-চাপে
মুখ দিয়া রক্ত উঠে,
আগুণে গলিয়া প্রাণ
বুকে বুকে ঢেউ ছোটে! ১৭

এমন করিয়া আর
কত র'ব, ভাবি তাই,
কাঁদিব কাহার কাছে
তুমিতো জগতে নাই! ১৮

(প্রিয়-প্রসঙ্গ-রচয়িত্রী)

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩২৭ সংখ্যা।	চৈত্র ১২৯৮—এপ্রেল ১৮৯২।	৪র্থ কল্প। ৫ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ভারতের লোকসংখ্যা—১৮৯১ সালের গণনানুসারে স্থিরীকৃত হইয়াছে, সমগ্র ভারতের অধিবাসিসংখ্যা ২৮৮ কোটি, তন্মধ্যে হিন্দু প্রায় ২০ কোটি ৭৬ লক্ষ, মুসলমান ৫ কোটি ৭৩ লক্ষ, খৃষ্টান ২২ লক্ষ, ৮৪ হাজার, জৈন ১৪ লক্ষ, ব্রাহ্ম ৩৪০১, বৌদ্ধ ৭১ লক্ষ, পারসী ৮৯,৮৮৭, ইহুদী ১৭৮৯, জড়োপাসক ৯৩ লক্ষ, ৫০ লক্ষেরও অধিক ব্যক্তির ধর্ম্ম জানা যায় নাই। ১৮৮১ সালের গণনার উপর সর্ব্বশুদ্ধ ৩ কোটি ৫০ লক্ষ লোক বাড়িয়াছে।

বিধবাবিবাহে পূর্ব্ব স্বামিধনে স্বত্বলোপ—ঢাকার ৺ ভগবান্ চন্দ্র রায়ের বিধবা বামাসুন্দরী ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে পুনর্ব্বিবাহিত হন। তিনি স্বামীর ধন ত্যাগ করিয়াই আসেন, কিন্তু তাঁহার সপত্নী-কন্যা মাতঙ্গিনী পিতৃত্যক্ত সমুদায় সম্পত্তির দাবী করাতে তাঁহার দেবরেরা তাঁহার স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার প্রয়াস পান। ঢাকার সব জজ তাঁহার বিপক্ষে ডিক্রী দেন, আপীলে জজ সাহেব সে ডিক্রী খণ্ডন করেন। হাইকোর্টে আপীল হয়। জজ প্রিন্সেপ ও বন্দ্যোপাধ্যায় বিচারে বসিয়া ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। জজ উইলসন তাহাদের সঙ্গে বসিয়াও মীমাংসায় আসিতে পারেন নাই। পরে চিফজষ্টিস, প্রিন্সেপ, উইলসন, পিগট ও চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় ফুল বেঞ্চে বসেন। প্রিন্সেপ সাহেব ব্যতীত আর সকলেই বামাসুন্দরীর বিরুদ্ধে মত দিয়াছেন।

রাজপ্রতিনিধির শৈলযাত্রা—গবর্ণর জেনারল আগামী ২৮এ মার্চ

কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বোম্বাই প্রভৃতি পরিদর্শন পূর্ব্বক ২১এ এপ্রেল সিমলায় পৌছিবেন।

কুমারী ভ্যান টাসেলের মৃত্যু—ঢাকার বেলুন হইতে নামিতে গিয়া ইনি সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হন, পরদিন প্রাতে তাহাতেই মৃত্যু হয়। ইনি ৩৬ বার বেলুন প্রদর্শনী দ্বারা দর্শকদিগকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছিলেন। ঢাকা তাঁহার কাল হইল।

উদাসীনের চিন্তা।

বসন্তকাল ফাল্গুন মাস, সূর্য্যোত্তাপ ক্রমশঃই পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। শীতের প্রকোপ তত নাই। শীতল সমীরণ দক্ষিণ দিক্ হইতে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। উদ্যানের নব শোভা। বৃক্ষলতা নব মুকুলে সুসজ্জিত, পুষ্পগন্ধে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ। উদ্যানে বৃক্ষ শাখোপরি উপবেশন করিয়া পিককুল সুমধুর সঙ্গীত লহরীতে সকলের মন মুগ্ধ করিকরিতেছে। এমন সময় একদিন অপরাহ্ণ সময়ে সরোজিনী ও তাহার দাদা সুশীলকুমার উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছে, ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্তি বোধ হইল। শ্রান্তিদূর করিবার জন্য উভয়ে এক প্রকাণ্ড বৃক্ষতলে উপবেশনার্থ গমন করিল। এমন সময়ে দূর হইতে উদ্যানের মালী উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, "মশায়! ওদিকে যাবেন না, ঐ গাছের তলে একটা বড় কেউটে সাপ।" এই কথা শুনিয়া ভাই ভগিনী গতিরোধ করিল ও অন্য দিকে পাদবিক্ষেপ করিতে লাগিল। পথ চলিতে চলিতে সরোজিনী জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা! ঐ মালীর ত কোন স্বার্থ নাই,তবে এ আমাদের সাবধান ক'রে দিল কেন? ওর সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই, ও আমাদের চিনে না, কোন লাভের আশা নাই, তবে কেন ও আমাদের এই বকুল তলে যেতে নিষেধ কল্লে। আমাদের সাপে কামড়ালে ওর ত কোন কষ্টই হবার কথা নাই।"

সুশীল—তুমি কি মনে কর মানুষের সকল কাজই স্বার্থ থেকে হয়? ভাল এই যে দেশের অবলা বান্ধবগণ তোমাদের অবস্থা ভাল করিবার জন্য এত চেষ্টা কচ্চেন তাঁহাদের এতে কি স্বার্থ? বরং দেশের লোক তাঁদের ঘৃণা করে, কতজন কত কথা বলছে, কই তাঁরাত তাতে কান দিচ্ছেন না।

সরোজিনী—তাঁরা পৃথিবীর স্বার্থ না খুজতে পারেন, কিন্তু তাঁরাও পরকালের স্বার্থ খুঁজছেন। এ কাজ কল্লে ঈশ্বর প্রীত হবেন, পরকালে তাঁহাদের সুখ হবে এই

উদ্দেশ্যেত তাঁরা একাজ কচ্ছেন। একি স্বার্থ নয়?

সুশীল—ঠিক তাঁরা কোন উদ্দেশ্য করে একাজ করেন, এ আমার বোধ হয় না। মানুষের প্রতি তাঁদের যে স্বাভাবিক ভালবাসা আছে, সেই ভাল বাসাই তাঁদের একাজে প্রবর্ত্তক। তাঁরা একাজ না করে থাকতে পারেন না। ঐ মালীর বিষয় ভাবলে এবিষয়টা একটু ভাল করে বুঝতে পারবে। ঐ মালী পৃথিবীর কোন স্বার্থ সাধন জন্যও কাজ করে নাই। পরকালে সুখে থাকবে কি ঈশ্বর ওকে ভাল বাসবে এভাব ও ওর মনে হয় নাই। ঈশ্বর কি, পর কাল কি হয়ত এবিষয়ে ওর পরিস্কার জ্ঞানও নাই। মানবের প্রতি যে এর স্বাভাবিক ভাল বাসা আছে, তাহাই ইহাকে একাজে প্রবৃত্ত করিয়াছে, মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণ এই স্বাভাবিক অকৃত্রিম ভালবাসাকে সহানুভূতি বলিয়াছেন।

সরোজিনী—এর কোন পার্থিব স্বার্থ নাই একথা ঠিক, কিন্তু পারমার্থিক স্বার্থ সম্বন্ধে যাহা বলিলে, তাহা ঠিক্ কি না বলিতে পারি না, চল একবার গিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করি?

সুশীল—জিজ্ঞেস কর্ব্বার কোন দরকার নাই। তবু তোমার সন্দেহ ভাঙ্গবার জন্য চল যাই। এই বলিয়া ভাই ভগিনী সেই মালী যেখানে কাজ করিতেছিল, সেই দিকে চলিয়া গেল। মালী আপনার মনে আপনি কাজে ব্যস্ত। সুশীল জিজ্ঞাসা করিল—ভাল মালী তুমি আমাদের বকুল তলে যেতে নিষেধ কল্লে কেন?

মালী—কেন কি? ওখানে যে একটা বড় সাপ।

সরোজিনী—তাতে কি? আমাদের সাপে কামড়ালে তোমার কি?

মালী—তোমাদের কথা যে আমি বুঝলেম না। তোমাদের সাপে কামড়াবে আর আমি জেনে শুনে চুপ ক'রে থাকবো?

সরোজিনী—ভাল তুমি কি এটা পুণ্য কার্য্য মনে করে সাবধান করেছ।

মালী—এতে আবার পুণ্য কি, এত সকলেই করে, এ আর ত আমি একটা দান ধ্যানের কাজ করিনি।

সুশীল—সরোজ এখন বুঝলে যে মালী এটাকে সাধুকাজ মনে করে করেনি। মানুষের এটা স্বভাব যে এক মানুষ আর এক মানুষের কষ্ট দেখিয়া ক্লিষ্ট হয়, সুখ দেখিয়া সুখী হয়।

সরোজ—কোথায় সকলেত হয় না। চোর ডাকাত-এরা অপরের কষ্ট দেখিয়া ক্লিষ্ট হওয়া দূরে থাক, এরাত ইচ্ছাকরে অপরকে কষ্ট দেয়। এমন ও লোক দেখিতে পাওয়া যায় যারা পরের সুখ দেখিলে সুখী না হইয়া কষ্ট পায় এদেরইত পরশ্রীকাতর বলে।

সুশীল—তুমি ঠিক্ বলেছ, সকলের প্রাণে সহানুভূতি নাই। কিন্তু এদের

এ অবস্থা স্বাভাবিক নহে, ইহা বিকৃত অবস্থা।

সরোজ—আচ্ছা, তবে জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা চলে যায় কেন?

সুশীল—স্বার্থপরতাই ইহার কারণ। সুখলালসা সহানুভূতিকে ডুবিয়ে দেয়, আর সে উঠতে পারে না। ঐ মালীর কথা দিয়া আবার আমি তোমাকে এইটী বুঝাইতেছি। ঐ মালী স্বভাবতঃ আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু ও যদি অত্যন্ত সুখের জন্য লালায়িত হইত, আর অল্প অর্থে সে সুখ না পাইত, তাহা হইলে সুখ লাভের জন্য ওর অর্থপিপাসা বাড়িয়া যাইত এবং সুযোগ পাইলে অসদুপায়ে অর্থ লাভের জন্য ব্যাকুল হইত। আমার সঙ্গে যে ঘড়ী চেন আছে, আমাদের সাপে কামড়াইলে অচেতন হয়ে পড়্‌ব, তখন সে অনায়াসে ঘড়ী চেন আত্মসাৎ কর্ত্তে পার্ক্সে আশাতেও আমাদের সাবধান কর্ত্ত না! অর্থলোভ তাহার এই যে সহানুভূতির ভাবকে গ্রাস করে ফেলত, যেখানে দেখবে সহানুভূতির অভাব সেখানে কোন না কোন স্বার্থ লুকায়ে রয়েছে।

সরোজিনী—ভাল, আমাদের বাড়ীর বুড়ী দিদি যে পর নিন্দা করে বেড়ায় ইহা কি সহানুভূতির অভাব জন্য নহে? কোথায় একাজের কষ্ট দেখে সে দুঃখ কর্ব্বেন তা না করে যাতে তাকে সকল লোক ঘৃণা করে, যাতে তাকে কষ্ট পেতে হয় এরই জন্য বাড়ী বাড়ী তার নিন্দা-গেয়ে বেড়াচ্চে। ভাল এতে ওর কি স্বার্থ?

সুশীল—ভাল বুড়ী দিদি চায় কি জান? সে চায় সকলের প্রশংসা, তাই দেশ শুদ্ধ লোকের নিন্দা করে তাদের ছোট কর্ত্তে চায়। আর দেশ শুদ্ধ লোক মন্দ হলে কাজেই লোকে বুড়ী দিদিকেই ভাল বলবে এই তাহার ভিতরে ভিতরে বিশ্বাস। বুড়ী দিদি এটা টের পায়না। প্রশংসা-প্রিয়তাই বুড়ী দিদির সহানুভূতির মাথা খেয়ে দিয়েছে!

সরোজিনী—ভাল এটাত বুঝলেম। কিন্তু উপরে যে পরশ্রীকাতর লোকদিগের কথা বল্লেন, তাদের পরের সুখে দুঃখী হওয়ার কি স্বার্থ? অন্যের সুখ দেখে জলে পুড়ে কেন খাক হয়ে যায়?

সুশীল—স্বার্থ আছে বই কি? তারা চায় সকল লোক তাদের সমান হয়। সমান না হইলে যে তাহাদিগকে এদের কাছে একটু নীচু হতে হয়। এই নীচু হওয়া তারা সহ্য কর্ত্তে পারে না। অথচ যে উপায় অবলম্বন করে আপনার উন্নতি করিয়া উচুদের সমান হওয়া যায়, সে উপায় অবলম্বনের প্রবৃত্তি নাই। তাই বড়কে ছোট করিয়া যাঁরা উচুতে আছেন তাদের নীচে নাবাইয়া সমান কর্ত্তে ইচ্ছা করে থাকে। এইরূপে সহানুভূতি স্বার্থের কবলে মারা পড়ে।

সরোজিনী—দাদা আজ তোমার নিকট অনেক কথা শিখলেম। দাদা আমার মনে আস্তে আস্তে পরশ্রী কাতরতা প্রবেশ কচ্ছিল। কেহ আমার সমবয়স্কাদিগকে প্রশংসা কল্লে আমার যেন একটু অসহ্য হত। অথচ তাদের মত হবার জন্ত আমার চেষ্টা ছিল না। আজ হইতে এ খারাপ ভাব প্রাণ হতে তাড়িয়ে দিব এবং যাতে আপনার উন্নতি কর্ত্তে পারি তারই চেষ্টা কর্ব্বো, দাদা আজ সন্ধ্যা হয়েচে চল ঘরে ফিরে যাই। আর এক দিন এবিষয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলবো।

সতী ও শান্তি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দীননাথ দ্বিবেদী গুরুকে দিনু ওঝা উপস্থিত। বিলেসদিদির নাতিনীর মুখের দিকে চাহিয়া ভ্রুকুঞ্চিত ও মুখ বিকৃত করিয়া বলিল "এক খানা আরসি আন দেখি।" আরসি আনিয়া দিলে পর, দিনু ওঝা আরসি "পড়িয়া" সেই মেয়েটীর মুখের কাছে ধরিল। কিছুক্ষণ তাহার মুখের প্রতিবিম্ব দেখিয়া বলিল, হ্যাঁ চিনেছি; আচ্ছা দেখি বাবা, কার কত গুরুবল। এই বলিয়া দিনু ওঝা "ফুঁ" দিতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ অনবরত ভ্রমরের মত শব্দ করিতে করিতে যখন হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিল, "হাড়ীর ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে, শীগ্গির ছাড়," অমনি একটি ছেলে ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল। সে মনে করিল, "বুঝি আমাকে ধরে"। এইরূপ কিয়ৎ কাল হুঙ্কার ছাড়িয়া শেষে "জল পড়া" দিল। এমন সময় এক বৃদ্ধা বলিলেন, হ্যাঁ গো, "গুনিনের পো," আরসির ভেতর কা'কে দেখলে?" দিনু ওঝা বলিল, থাক্, আর নাম কর্ব্বো না; করে ফেলেছে এক কাজ।" বৃদ্ধা তাহার হাতে একটা টাকা দিয়া বলিলেন, "অসন্তুষ্ট হইও না, ভাল হ'লে তখন খুসী কর্ব্বো।" দীনু ওঝা "তথাস্তু" বলিয়া টাকাটি পকেটস্থ করিল। এমন সময় দিনু ওঝা, কেশবকে আসিতে দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, কিহে ভাই রায়ের পো, এস ভায়া এস, তার পর, আছ কেমন?

কেশব। "হাতাল যাতাল পিতেল বৈতেল" কখন যে কাকে কি বলে, কিছুই ঠিক নাই। কি দিনু দাদা, গাঁজার মাত্রাটা আজ কিছু বেড়েছে বুঝি, তাই বলুছ "ভাই রায়ের পো"।

দিনু ওঝা—আঃ খুড়ি, কি জান ভাই, "মনীনঞ্চ মতিভ্রমং"।

কেশব—গাঁজা খোরের হাতে পড়ে সংস্কৃত ভাষাটাও মারা যায় দেখ্‌ছি!

দিহুগুরু—হা—হা, "গাঁজাকা গুঁজি মহাদেওকা পুঁজি। যে বলে গাঁজা মন্দ, তার ধরুক পঞ্চানন্দ।" ভায়া, গাঁজার মজা তুমি কি বুঝবেহে? এক বোঝেন শিবু খুড়ো, আর বোঝেন শম্ভা-রাম। তা, যাউক, ভায়া, আছ কেমন বল। অনেক দিন দেখা হয় নি। আমি তোমার সঙ্গে দেখা কর্ব্বো মনে কচ্চি, আর তুমি এসে পড়েছ। তা যাই হ'ক তুমি অনেক দিন বাঁচবে।

কেশব—আমার সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্য এত আগ্রহ কেন? আমাকে কি ডাইনে খেয়েছে, না ভূতে পেয়েছে?

দিহু—ওহে ভায়া, আমি যত দিন বেঁচে আছি, ভূতের বাবার সাধ্যি কি যে তোমাকে ছোঁয়। দেখ ভায়া, তোমাকে আমি বড় ভাল বাসি। যাই হ'ক তোমাকে শীগ্‌গির আমি এক খানি কবচ দিচ্ছি। তোমার কিছুই খরচ হবে না। অন্য কেহ হলে বিশ টাকার কমে হতো না। তা যা হ'ক আমি তোমাকে অমনি দিচ্ছি। দেখ ভায়া, ভাল বাসায় কি না হয়, লোকে কথায় বলে "ভাল বাসায় বাঘের দুধ মেলে।" যা হ'ক এসব উপ-কার মনে রেখো।

কেশব—দিহু দাদা, আমার সঙ্গেও চালাকি। তোমার বিদ্যাবুদ্ধি আমি সব জানি। কেবল বোকা লোককে ঠকিয়ে পয়সা নেবে। কিন্তু ইহা নিশ্চয় জেনো, যে ইহা কখনও ধর্ম্মে সবে না।

দিহু—ওহে কেশব, কি জান, তুমি ছেলে মানুষ, আর কিছু ইংরাজী গর্ব্যরস পেটে পড়েছে কিনা, তাই তুমি অমন কথা বলছো। যেমন পাপ কখন লুকায় না, সাগর কখন শুকায় না, তেমনি "মুনিবার্ক্য" কখন লঙ্ঘন হয় না। মন্তর তন্তর এ সব যদি মিথ্যে হয়, তা হইলে সমস্ত জগৎ মিথ্যে। তুমিও মিথ্যে, আমিও মিথ্যে, রামও মিথ্যে, রহিমও মিথ্যে; আর "হাড়ীর ঝী চণ্ডীর আজ্ঞে"ও মিথ্যে, "মামীর মার শুলে শীগ্‌গির লাগ্যে" ও মিথ্যে।

কেশব—দিহু দাদা, তুমি যে ইংরাজী গব্যরসের কথা বল্লে, বাস্তবিক ইহা প্রকৃত গব্যরস। এই গব্যরস পান করে অনেক গবচন্দ্র উদ্ধার হয়ে গেল তোমাদের হাত হ'তে। "সাগর কখন শুকোয় না" যে বলছ তাহা ঠিক নয়। তুমি যদি কখন ভূবিদ্যা পড়্‌তে, তাহলে কখনও ও কথা বিশ্বাস কর্‌তে না। সাহারা মরুভূমি আগে সাগর ছিল, তার পর শুকিয়ে মরুভূমি হয়েগেছে। আর পাপ যে কখন লুকোয় না বলছ, ইহা অতি সত্য কথা। দিহু দাদা, নিশ্চয়ই জেনো পাপ কখনই লুকোয় না। প্রতারণা প্রবঞ্চনা দ্বারা লোককে ঠকিয়ে তোমরা যে পাপ সঞ্চয় করছ, এ পাপ কখন লুকোবে না। এ পাপের শাস্তি নিশ্চয়ই ভোগ কর্‌তে হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিলেমদিদির নাতিনীর আজি ভারি বেগতিক। বাঁচে কিনা সন্দেহ। দিদ্‌-গুরু "ফুঁক্‌ ফাঁক্‌" ক'রে গেল "জল পড়া" দিয়ে গেল; তাহাতে কিছুই হইল না। বরং তাহার অসুখ ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। মেয়েটার মা মেয়েটীকে কোলে লইয়া চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসাইতেছেন। বিছানার পাশে অনেক গুলি স্ত্রীলোক তাহাকে ঘেরিয়া বসিয়া আছেন। যাঁহার যাহা মনে উঠিতেছে, তিনি তাহাই বলিতেছেন। কোন মেয়ে বলিতেছেন, "দিমুওঝার মন্তর ভাল নয়"। অন্য এক জন বলিতেছেন, "শ্যামীর মার মন্তর ভাল, সে বেশ ভাল জলপড়া জানে"। আর এক জন বলিতেছেন, শ্যামীর মার মন্তর ভাল বটে, কিন্তু তার একটু দোষ আছে; সে সব সময় লোভ সামলাতে পারে না। সে দিন ওঁদের খোকাকে খেয়েছিল।" এই রূপে নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিলেন। কিয়ৎ কাল পরে তথায় শান্তি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শান্তি বলিলেন মাসী মা তুমি অমন ক'রে কাঁদ্‌চো কেন? কাঁদলে কি হবে? তোমার মন এরূপ উদ্বিগ্ন হলে ছেলের অসুখ বাড়বে বৈ কমবে না। কেশব দাদা গেল কোথায় ঠাকুর মা, তাঁকে পাঠিয়ে দিয়ে সরোজিনী দিদিকে আন্‌লে হয় না? তিনি শিশু চিকিৎসায় খুব ভাল।" ঠাকুর মা বলিলেন, সেই ভাল। তাঁকে আনা উচিত। নতুবা ছেলের যেরূপ অবস্থা এতে বড় একটা ভালর আশা দেখছি না।" অবিলম্বে কেশব সরোজিনীকে আনিবার জন্য চলিয়া গেলেন। প্রায় বেলা ৪টার সময় সরোজিনীকে লইয়া আসিতেছেন, পথিমধ্যে অদূরে কান্নাগোল শুনিতে পাইলেন। বাটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময় কে একজন বলিল খুঁকী আর নাই, তার মা উন্মাদিনী হয়ে আছাড় পাছাড় খাচ্চে, ৪।৫ জন মেয়ে তাঁকে ধরে রাখ্‌তে পাচ্চে না।" এমন সময় কেশব ও সরোজিনী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সরোজিনী আসিয়া খুকীর বিছানার পাশে বসিলেন। খুকীর গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন বুক ধুক ধুক্‌ করিতেছে, তিনি নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "এখনও আশা আছে, রীতিমত চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা হলে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। তিনি (থার্ম্মোমিটার) তাপমান যন্ত্র দ্বারা তাহার শরীরের তাপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। তিনি ঔষধের ব্যবস্থা লিখিয়া কেশবকে দিয়া বলিলেন "তুমি মহেশবাবুর ডিস্‌পেনসারি হ'তে শীগ্‌গির এই ঔষধটী আনিয়ে দাও।" কেশব ঔষধ আনাইয়া দিলেন। দুইবার ঔষধ খাওয়াইবার পর মেয়েটী যেন কতকটা বল পাইল, চক্ষু মেলিল, হাত পা নাড়িল, তখন সকলে মনে করিল, এ যাত্রা মেয়েটী রক্ষা পাইল।

এদিকে সরোজিনীকে জল খাওয়াইবার জন্য শাস্তি তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। মেয়েটীর মা তাঁহার মেয়ের অবস্থা এখন ভাল দেখিয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। সরোজিনী তাঁহার মেয়েটীকে বাঁচাইয়া দিলেন, সুতরাং মনে মনে তাঁহাকে কত আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন, কতবার তাঁহার পাকা মাথায় সিঁদুর পরাইতে লাগিলেন, কত ঠাকুর দেবতার "ছলন" মানত করিতে লাগিলেন, কত পীরের "সিন্নী" দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ফল কথা তিনি আজি তাঁহার মেয়ের অবস্থা ভাল দেখিয়া যারপর নাই আনন্দিতা হইয়াছেন। হাজার হউক, মায়ের প্রাণ ত, সন্তানের মঙ্গল কামনায় মায়ের প্রাণ যে কিরূপ হয়, তাহা মা ব্যতীত আর কে জানিবে?

আমি কে?

আমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছি? কোথায় যাইব? কেন আসিয়াছি? কেন যাইব? এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার স্রষ্টা ব্যতীত আর কেহ সক্ষম নহেন। নিজ নিজ বিশ্বাস মত যিনি যেরূপ বলুন, কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর দিতে সেই অনাদি—অজ—জগৎস্রষ্টাই সক্ষম। আমি কোথা হইতে আসিয়াছি? কোথায় যাইব? কেন আসিলাম? কেন যাইব? আমি না আসিলে জগতের কি কোন ক্ষতি হইত? আমার আগমনে জগতের কোন উপকার কিম্বা অভাব পূরণ হইয়াছে কি? যুক্তি ও তর্কের দ্বারা এই প্রশ্ন সমূহের উত্তর দেওয়া অন্ধকারে ঢিল মারা। যৌগিক, ভৌতিক ও প্রাকৃতিক সকল ঘটনার কারণ যখন সেই বিশ্বস্রষ্টা, তখন এই সব কূট প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর তিনি ব্যতীত আর কেহ কখনও দিতে সক্ষম নহে। আমরা "আমাকে" জানি না—চিনি না। অথচ "আমাকে" লইয়াই ব্যস্ত—এত ব্যস্ত যে নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পাইতেও বিরক্তি বোধ করি। কেহ যদি আমার নিকট আমার কোন সুপরিচিত ব্যক্তির নামোল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে—"ওহে! তুমি অমুক ব্যক্তিকে চেন কি?" আমি অমনি তাঁহার মুখ হইতে কথা কাড়িয়া লইয়া বলি—"হাঁ আমি তাঁহাকে বেশ চিনি।" কিন্তু সে কি রকম চেনা? নামমাত্র চেনা—চেহারা মাত্র চেনা। আমি যখন আমাকে চিনি না, তখন তোমাকে চেনা যে আরও কঠিন। যদিও আমরা "আমিত্ব" লইয়া ব্যস্ত থাকি, তবুও কি আমাকে জানি? জানিব কি করে?

আমি কি করিয়াছি, কি করিতেছি ও কি করিব যখন জানিনা, তখন "আমাকে" চেনা ত সহজ কথা নয়।

আমি কি করিয়াছি? আমি কি করিয়াছি তাহা আমি জানি না, সম্ভবতঃ আমাদ্বারা সদসৎ উভয় কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করা হইয়াছে। অতএব আমি কি করিয়াছি তাহা যদি জানিতাম তবে আমাদ্বারা অসৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে কেন? এমন লোক অতি বিরল যাঁহাদ্বারা জীবনে একটীও অসৎ কার্য্য করা হয় নাই, এমন কি আমরা অনেক সময় এমন ভুলে পড়ি যে সৎ কার্য্য করিতেছি মনে করিয়া অসৎ কার্য্যের ফল গ্রহণ করি। মনুষ্য-জীবনে সুখশান্তি লাভ করা প্রায়ই ঘটে না, (ব্রহ্মজ্ঞানী, যোগী বা তত্তুল্য মহৎ ব্যক্তিগণের কথা বলিতেছি না) জগৎ সুখের জন্য ব্যস্ত —নিজের উন্নতির জন্য ব্যস্ত—জীবনের জন্য ব্যস্ত, সম্মানের জন্য ব্যস্ত, এক কথায় আমাকে লইয়াই ব্যস্ত।

"উন্নত হইব বলি নত হও আগে।
দুঃখের শৃঙ্খল পর সুখ অনুরাগে।
সম্মান রক্ষার হেতু হও হতমান।
জীবন রক্ষার হেতু দিতে চাও প্রাণ।"

এ উপদেশটীত সারগর্ভ, কিন্তু গ্রহণ করিতে পারি কই? বাল্যাবধি ত তোতার মত পড়িয়াছি—গরুর মত শুনিয়াছি যে—কাহাকে কুবাক্য কহিও না, মিথ্যা কথা বলিওনা, ইত্যাদি, কিন্তু সে সমস্ত গ্রহণ করি কই? পরিহাস ছলেও ত একটি মিথ্যা কথা না বলিলে দিনটী যায় না, শিক্ষা ও সঙ্গ জন্য ইহার কমী বেশী হইতে পারে; কিন্তু একেবারে নির্ম্মূল হওয়া সুকঠিন। বাস্তবিক সর্ব্বপ্রকারে জিতেন্দ্রিয় না হইলে কেহ সত্যকে সম্যক্ রূপে আয়ত্ত করিতে পারেন না। নিসর্গের নিয়ম এই যে যে যাহা চায় সে তাহা পায় না, যে যাহা না চায় সে তাহা পায়। ইহার কারণ বোধ হয় অতি সহজেই মীমাংসিত হইতে পারে, কারণ যাহার যাহাতে অভাব সে তাহা চায়, আর যাহার যাহাতে অভাব নাই সে তাহা চায় না; ইহাই বোধ হয় "যে যাহা চায় সে তাহা পায় নায়" কারণ। ব্যাস, বাল্মীকি বশিষ্ট, পরাশর, কণাদ, পাতঞ্জল, বিষ্ণু, অত্রি প্রভৃতি মহাত্মাগণ যোগ, প্রচুর বিদ্যা, প্রভূত চিন্তাশীলতা, নির্জ্জন বাস ও দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াও যখন সংসারের কূট প্রহেলিকার মীমাংসায় সম্যকরূপে উপনীত হইতে পারেন নাই, তখন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তোমার আমার কা কথা? সংসারের কূট প্রহেলিকা আমরা জানিনা, বুঝিনা যখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল, তখন "আমি কি করিয়াছি" তাহাও জানিনা। আমরা যাহা করিয়াছি, যদিও তাহার ফল সেই কার্য্যের গুণ বাহির করিয়া দেয়, কিন্তু আবার অনেক সময় সেই ফল গা ঢাকা দিয়া অন্য কার্য্য দ্বারা প্রকাশ পাইয়া পূর্ব্ব কার্য্যকে সম্পূর্ণ গোপনে রাখে। অতিপরিশ্রম,

অলসতা, অতি ভোজন, অস্বাস্থ্যকর আহার, অথবা পিতৃ মাতৃ দোষের জন্ত কাহারও শরীরটা একটু একটু করিয়া ক্ষয় হইয়া আসিতেছিল, এমত সময় সেই ব্যক্তি একদিন অম্লরস একটু অধিক খাইয়া জরগ্রস্ত হইলেন এবং সেই জরে তাঁহার মৃত্যু হইল। এ স্থলে অম্লরস খাওয়াই তাঁহার জর ও মৃত্যুর কারণ নির্দ্দিষ্ট হইবে, কিন্তু পূর্ব্ব হইতে যে সকল কারণে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া মৃত্যু নিকটে আসিতেছিল, তাহা এ স্থলে ঢাকা থাকিবে, এই সকল ও অন্তান্ত দুর্জ্ঞেয় কারণ সমূহের জন্তই বোধ হয় আমরা কি করিয়াছি তাহা জানি না।

আমি কি করিতেছি তাহাও জানি না, কেননা যখন—"জানামি ধর্ম্মং নতুমে প্রবৃত্তিঃ। জানাম্যধর্ম্মং নতুমে নিবৃত্তিঃ॥" আমি ধর্ম্ম জানি, কিন্তু তাহাতে আমার প্রবৃত্তি নাই, আমি অধর্ম্মও জানি, তাহাতে আমার নিবৃত্তি নাই। কিন্তু তার পর আবার সংসার সমুদ্রের ঘটনা-স্রোতে যে মনুষ্যকে কখন কোন্ দিকে লইয়া ফেলে, তাহাও মনুষ্যের দুর্জ্ঞেয়। যখন পলাশীক্ষেত্রে সিরাজের ও ক্লাইবের সৈন্ত গণ পরস্পর সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করে, তখন কি সিরাজ কল্পনায়ও বিদেশী বণিক্ ক্লাইবের জয় হইবে ভাবিয়াছিলেন —যখন রাজস্থানের রাজদল পরস্পর শত্রুতা করিয়া নিস্ব ও তেজোহীন হইতেছিলেন, তখনও সিন্ধিয়া ও হলকার মহারাষ্ট্রীয়দ্বয়ের তেজে রাজস্থান পুড়িতেছিল এবং ঐ বীরদ্বয় ইচ্ছা করিলে ভারত সাম্রাজ্য তাঁহাদেরই হইত, কিন্তু সমুদ্র পার হইতে ইংরেজ আসিয়া সেই ভারত রাজ্য অধিকার করিলেন! নেপোলিয়ন বোনাপার্ট এত যুদ্ধ জয় করিয়া—এত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া অবশেষে সেন্ট-হেলেনায় বন্দীভাবে মানবলীলা শেষ করিবেন এ কথা কি তাঁহার শত্রুগণও পূর্ব্বে কল্পনায় আনিয়াছিলেন? মহারাজ অজিত সিংহ যিনি স্বীয় বাহুবলে শত্রু কুলের বিজেতা, তিনি তাঁহার বালক পুত্র নরাধম ভক্তের হস্তে প্রাণ হারাইবেন, তাহা কি স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলেন? একদিন তাঁহার মহিষী ভক্তের নিকট অজিতকে সাবধান থাকিতে বলায় তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, "মহিষি! ভক্ত আমার পুত্র, তায় আবার বালক; যে আমার একটী চপেটাঘাতে প্রাণ হারাইতে পারে, সে আমার কি করিবে?" এ কথাগুলি মহারাজ অজিত সিংহের বীরত্বের, নির্ভীকতার ও উদারতার যেমন উপযুক্ত, সত্বর পক্ষেও তেমনি সত্য। এই সকল সত্বর সত্যকে ঘটনা অসম্ভব ও বিপরীত আকারে পরিণত করে, মনুষ্যের সহস্র চেষ্টা এবং প্রাণগত যত্নও সে ঘটনা স্রোতকে রোধ করিতে পারে না। অতএব মনুষ্যের ইচ্ছা, চেষ্টা, ও যত্নেও যখন অনেক সময় বিপরীত ফল দাঁড়ায়,

তখন আমি করিতেছি তাহা কি করিয়া জানিব?

আমি কি করিব! তাহাও আমি জানিনা, জানা মনুষ্যের সাধ্যও নয়। মনুষ্যকে ঘটনা-স্রোত কোথায় কি কার্য্যে নিযুক্ত করে, তাহা সাধুমিক বিদ্যাসম্পন্ন ভবিষ্যৎদর্শীরাও বুঝিতে পারেন না। কথিত আছে পণ্ডিতবর বরাহ ১০০ শত বৎসর পরমায়ু পুত্রকে ১০ বৎসর বাঁচিবে বলিয়া তামের হাঁড়িতে করিয়া জলে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, রাজা দশরথ অভিষেকের জন্য সমস্ত আয়োজন করিলেন, ফল দাঁড়াইল সেই পুত্রের বনবাস ও নিজের মৃত্যু। অতএব কি যে করিব, তাহাও ভবিষ্যতের গর্ভবাসে নিহিত। তাই যখন আমি কি করিয়াছি, কি করিতেছি ও কি করিব তাহা জানিনা, তখন আমি কে? ইহার উত্তর বিধাতা ব্যতীত কে দিবেন? আমি ইচ্ছামত কিম্বা কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুকূলে কার্য্য করিতে চেষ্টা করিব, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি বা না পারি, বিশ্বাস করিতে হইবে যে—"ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি॥" কেননা "আমি ইহা করিয়াছি" "উহা করি নাই" এরূপ ভাবিবার আমি কে? "I am the straw in the hands of my Maker. He does his will with a straw as with a mountain." আমি সৃষ্টিকর্ত্তার হস্তে একগাছি তৃণ, তিনি পর্ব্বতকে লইয়া যেমন তৃণকে লইয়াও সেইরূপ ইচ্ছামত ব্যবহার করেন।

কুঃ রাঃ।

দ্বাদশকন্যা (পারিবারিক গল্প) *

একদা সে শয়তান—নরকাধিপতি
বিবাহ করিতে তার উপজিল মতি।
অপার সাম্রাজ্য—নাহি রাজ্যে অভিলাষ,
বড় সাধ ভার্য্যা লয়ে করে সুখে বাস।
দেখিল স্বরাজ্য খুঁজি রাজলক্ষ্মী তার
নাহি মিলে, যোগ্য পাত্রী কোথা পাবে আর?
অবশেষে নরলোকে করি আগমন,
লভিলা মনের মত রমণী-রতন!
মনুজ-দুহিতা মাঝে অধর্ম্ম রূপসী
লভিয়া নরকনাথে কতই না খুসি!
মহাসুখে বহুকাল করিলা কত্তন,
পত্নীসহ দেশে যেতে করিল মনন।
স্বদেশে, না গেলে রাজ-দণ্ড অনর্থ!
কে সাধিবে রাজা বিনে রাজ্যের কুশল?

* ইংরাজী হইতে অনুবাদিত।

দুহিতার সদুপায় না করি, ভবনে—
রাখিবে সুবিজ্ঞ পিতা সম্ভবে কেমনে?
বারটী বালিকা রাজা বড় ভাগ্যবান,
একে একে সকলের করিলা সংস্থান।
প্রথম তনয়া দুষ্টা আকাঙ্ক্ষা প্রবল,
ধনীর সন্তানে বরি বাসনা সফল।
দ্বিতীয় তনয়া তার-ধনলিপ্সা নাম,
কৃপণেরে বরি বামা পূর্ণ মনস্কাম।
তৃতীয় তনয়া নাম-পাশব প্রকৃতি
যদ্যপি ইতরাচারী হন প্রাণপতি।
চতুর্থ তনয়া হিংসা-মধুরভাষিণী,
শিল্পীরে সঁপিলা প্রাণ-চাতুরী বাখানি!
পঞ্চম তনয়া কিবা রূপসী-ছলনা,
চাটুকার বিনা কারে বরিবে ললনা?
ষষ্ঠ কন্যা বিলাসিতা-পরমারূপসী,
সাজি সজ্জা দেখে শুনে সেনার প্রেয়সী।
সপ্তম তনয়া তার-দরিদ্রতা নাম,
কেরাণীর গৃহলক্ষ্মী ছাড়েনা সে ধাম।
অষ্টম তনয়া নাম অন্যায়-বিচার,
বিচারকে বরি সদা আনন্দ অপার!
নবম তনয়া নাম-অমিত আচার,
বরিলা যুবকে যেবা লুটায় সংসার,
বিপুল পৈতৃক ধনে হয়ে অধিকারী;
সম্বৎসরে সর্ব্বস্বান্ত পথের ভিখারী!
দশম তনয়া তার নিঠুরতা নাম,
বরিলা পুরুষজাতি-কারে হবে বাম?
বৃথা গর্ব্ব প্রতিহিংসা অবশিষ্ট দুটী,
নিরুপায় একি দায় কোথা পাবে যুটী?
নাহি মিলে বর-পিতা ভাবি চিন্তি পরে
সঁপে দিলা রক্ষণার্থ রমণীর করে।
বহুদিন গত নিজ প্রণয় ভাজন—
অযোগ্য বলিয়া কেহ করেনি বর্জ্জন;
অথবা ভোলেনি কেহ 'আদিম স্বজাত'
যে যে গুণ পিতা হতে করিয়াছে লাভ।

প্রশ্নোত্তর।

আমার কোনও শ্রদ্ধাস্পদ আত্মীয় আমাকে নিম্ন লিখিত প্রশ্নগুলি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, আমি নিজজ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিলাম, তাহাই উত্তর লিখিলাম।

১ম প্রশ্ন। ধর্ম্মের মধ্যে কোন্ ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠতম?

১ম উত্তর। আমি যে ধর্ম্মে বিশ্বাসী আমার কাছে সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠতম; সেই রূপ যিনি যে ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন, তাঁহার কাছে সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠতম।*

* এই প্রশ্নটীর প্রকৃত সদুত্তর দেওয়া কঠিন।

২য় প্র। কোন নীতি সর্ব্বাগ্রে শিক্ষণীয়?

২য় উ। ইন্দ্রিয়সংযম।

লেখিকা বিশ্বাসের সম্মান করিয়া তাহার সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু সুবিচারের নিকটে এ মত রক্ষা পাইবে কি না, সন্দেহ। নরহত্যা, পরস্বাপহরণ, ব্যভিচার প্রভৃতি দুষ্কার্য্যও সময় সময় লোকে ধর্ম্ম বিশ্বাসে ও ধর্ম্মের নামে করে, সেগুলি কুসংস্কার ও বিশ্বাসের বিকার। যে ধর্ম্মে সত্য স্বরূপ ঈশ্বরের সত্যভাব জীবনে যত পরিস্ফুট হয়, সেই ধর্ম্মকেই তত শ্রেষ্ঠ বলা যায়। শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্ম খৃষ্টের কথায় "ঈশ্বরের ন্যায় পূর্ণ হওয়া", প্রাচীন ঋষির কথায় "আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ।"

বা, বো, স।

৩য় প্র। প্রাপ্তবয়স্কা কন্যা তাহার পিতার সহিত কিরূপে কথা বার্ত্তা বলিবে?

৩য় উ। মেয়ে বড় হইলে বাবার কাছে হাসিবে, গল্প করিবে, যাহা শিখিতে ইচ্ছা হয় জিজ্ঞাসা করিবে; বাবার কাছে দাঁড়াইলে মেয়ের হৃদয়ে যে ভক্তি, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস বহিতে থাকে, তাহারই শক্তিতে মেয়ে যে রকম ইচ্ছা সেই রকম কথা বলিবে। নয় তো কেবল হেঁট মুখে যোড়হাতে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইলে—ছিছি, মনে হইবে "বাবা উঠিয়া গেলেই বাঁচি"!

৪র্থ প্র। পিতা যদি কোনও অন্যায় কাজ করেন, সন্তান তাহার প্রতিবাদ করিবে কিনা?—যদি প্রতিবাদ করিতে হয়, তাহা হইলে কি ভাবে করা যায়?

৪র্থ উ। বাবা কোনও অন্যায় কাজ করিতেছেন, আমি সন্তান তাহা বুঝিয়াও যদি দুটো গালির ভয়ে তাহা না বলি, আমার স্বার্থপরতার জন্যে যদি বাবার নৈতিক ক্ষতি দেখিয়া তাঁহাকে সতর্ক না করি, তবে আমার সন্তানত্বে শতধিক্! "দোষাবাচ্যা গুরোরপি"—কিন্তু সে প্রতিবাদের ধরণটা স্বতন্ত্র। আমি গলায় কাপড় দিয়া বাবার পদতলে বসিয়া দু হাত যোড় করিয়া বলিব "বাবা, একাজ ভাল হয় নাই, এরকম কাজের ফল এই রকম মন্দ হইতেছে" তার পর বাবা যাহাই বলুন। বাবা দৃষ্টান্ত, গুরুজন মাত্রেরই প্রতি এইরূপ ব্যবহার প্রযোজ্য।

৫ম প্র। যাহাকে ভালবাস, সে কিরূপ ব্যবহার করিলে তোমার হৃদয় ভগ্ন হয়?

৫ম উ। কপটতা ও বিশ্বাস ঘাতকতা করিলে।

৬ষ্ঠ প্র। বন্ধুত্বের প্রধান উপকরণ কি?

৬ষ্ঠ উ। সরলতা ও বিশ্বাস।

৭ম প্র। সৌন্দর্য্য কি?

৭ম উ। প্রীতি।

৮ম প্র। সর্ব্বাপেক্ষা শত্রু কে?

৮ম উ। কপট বন্ধু।

৯ম প্র। সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল কে?

৯ম উ। যে কুপ্রবৃত্তি কর্তৃক চালিত হয়।

১০ম প্র। কোন্ কোন্ ঋতু সর্ব্বাপেক্ষা মধুর।

১০ম উ। ঘরে থাকিতে হইলে বর্ষা, বাহিরে যাইতে হইলে বসন্ত।

১১শ প্র। মানবের নিজের প্রতি কর্ত্তব্য কি?

১১শ উ। শরীর, মন ও আত্মার উন্নতি সাধন।

১২শ প্র। বিধবা রমণীর ব্রহ্মচর্য্য সুসাধিত হয় কিসে?

১২শ উ। আত্মসংযম অভ্যাস করিতে পারিলে।

১৩শ প্র। পুরুষ, ভার্য্যার বন্ধ্যাত্ব ঘটিলে দ্বিতীয় বার বিবাহ করিবে কি

না? না করিলে জনসমাজ ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া যাইবে কি না?

১৩শ উ। স্ত্রী জীবিতা থাকিতে কোনও ক্রমে পুরুষ দ্বিতীয় দার বিবাহ করিবেন না। কেবল সন্তান হওয়াই বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। দম্পতীর কর্ত্তব্য অনেক উপরে। বন্ধ্যাত্ব কচিৎ ঘটে, বালিকা বিধবাদিগের পুনঃসংস্কারের দ্বারা লোকসংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে পারিবে। বালিকা বিধবা কচিৎ ঘটে না।

১৪শ প্র। দাম্পত্য "শাসন" কাহাকে বলে?

১৪শ উ। "আমি কখনই কোনও মন্দ কাজ করিতে পারিব না, তাঁহার প্রাণে বাজিবে" স্বামী স্ত্রী এই কথা ভাবিয়া বিন্দু মাত্র অন্যায় হইতেও প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার নাম "দাম্পত্য শাসন"।

১৫শ প্র। দাম্পত্য সম্মান কিরূপ?

১৫শ উ। "সকল রমণীর মধ্যে আমার ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতম" আর "সকল পুরুষের মধ্যে আমার স্বামী শ্রেষ্ঠতম" দম্পতী এই রকম মনে করেন; ইহাকেই "দাম্পত্য সম্মান" বলা যায়।

১৬প্র। কিরূপ লোকের নিকটে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য?

১৬শ উ। হিংসুক এবং নিন্দুক।

১৭শ প্র। বিধবা রমণীর জীবনের নেতা কে?

১৭শ উ। প্রথম ঈশ্বর, দ্বিতীয় বিবেক, তৃতীয় ঈশ্বরের বিশ্বাসী সন্তান, এই তিন জনই বিধবা রমণীর জীবনের নেতা।

১৮শ প্র। সপত্নীভাব ভগ্নীভাবে পরিণত হইতে পারে কিসে?

১৮শ উ। প্রধানতঃ * তিন উপায়ে। সপত্নীরা উভয়ে দাম্পত্য প্রণয়ে অনভিজ্ঞা হইলে। কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগাক্রান্ত স্বামীর পত্নী হইলে। আর (জগদীশ্বর না করেন) বৈধব্য উপস্থিত হইলে।

১৯ প্র। স্বামী যদি দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করেন, তাহা হইলে প্রথমা স্ত্রী কি করিবে?

১৯ উ। নদীতে গিয়া কলসী সহযোগে বৈতরণী পার হইবে—তাহার ইহাই ব্যবস্থা—অন্ততঃ আমার শাস্ত্রে। আমি যদি মনু পরাশর প্রভৃতির সময়ে জন্মিতে পারিতাম, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ত দিয়া হিন্দু শাস্ত্রে এই কথাই লিখাইয়া রাখিতাম। বহু-বিবাহ পক্ষসমর্থনকারী মহাত্মারা আমাকে অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করিবেন।

শ্রীলেখিকা।

* বলা বাহুল্য শ্রদ্ধেয় বঙ্কিম বাবুর দেবী চৌধুরাণী সমস্ত প্রাপ্য নহে।

পড়িয়া ছড়ায়ে।

পড়িয়া ছড়ায়ে জগতের মাঝে,
দিবানিশি ঘুরি সদা মিছে কাজে,
ওগো, আপনে আনিতে আপনার মাঝে,
কি করে পারিব হায়!
দেখ, হইল রজনী আসে বিহঙ্গম,
আপনার নীড়ে নাহি ব্যতিক্রম,
এ, জীবন তামসী ফিরি দশদিশি,
কেন আবাসে মন না চায়!
কাঁদিছে 'বিদল' শূন্য 'শতদল'
না জানি কি গুণ ধরে ভূমণ্ডল।
হায়, নীর ত্যজে ক্ষীর, ফিরেনা মরাল,
নাজানি কি তবে চায়!
(সদা শূন্য সরসীতে ধায়!)

বেদনা বা দুঃখ।

জমাট অশ্রুর স্তুপাকার!
প্রাণের নীরব হাহাকার!
যৌবনের অতৃপ্ত বাসনা!
স্বরচিত কবির কল্পনা।
বিরহীর মৃত প্রিয় স্মৃতি!
প্রতিদানে নিরাশিত প্রীতি!
জ্ঞানকৃত পাপের স্মরণ!
হত্যাকারী আত্মসংগোপন।
অজ্ঞানের প্রাণহীন তাপ!
প্রকৃত বক্তৃতা অপলাপ!

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

সংরক্ষিত ফল।

আমেরিকানেরা এক অপূর্ব্বকৌশলে পক্ক ফল সকল টিনের পাত্রে অবিকৃত রাখিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র রপ্তানি করিতেছে। আধারে নিহিত ফল যতদিন ইচ্ছা অবিকৃত থাকে, ইহাতে স্বাদের কোন বৈলক্ষণ্য হয় না। কথিত আছে যে যে প্রক্রিয়াযোগে এরূপে ফল সংরক্ষিত হয়, আমেরিকাবাসিরা তাহা পম্পে নগরের ধ্বংসাবশেষ হইতে শিক্ষা করিয়াছে। বহুদিবস হইল একদা প্রথিত পম্পে নগরের স্থান বিশেষ খনন করিতে করিতে কতকগুলি বৃহৎ জালা আবিষ্কৃত হয়। তাহাদের মুখ একেবারে আবদ্ধ ছিল। খুলিয়া ফেলিলে উত্তম 'ফিগ' ফল সকল দৃষ্ট হইল। ইহা অবিকৃত ও তাজা রহিয়াছে। পম্পে নগর অনেক শতাব্দি পূর্ব্বে ভূমিকম্পে ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু ফলগুলি অদ্যাপিও অবিকৃত আছে ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে। এই সময় সিনসিনাটী বাসী কয়েক জন

আমেরিকান উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা জালাসকল পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন যে ফল সকল উত্তপ্ত জালা মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, ধূম উদ্গমনের একটী ক্ষুদ্র ছিদ্রও দৃষ্ট হইল। ঐ ছিদ্র দিয়া সমস্ত ধূম নির্গত হইলে তাহা গালাদিয়া একবারে বন্ধ করা হইয়াছিল। সুতরাং ফল অবিকৃত ও তাজা আছে। সিন-সিনাটীর লোকেরা ইহা দেখিয়া স্বদেশে এরূপ কৌশল প্রদর্শন করিয়াছে। তদবধি আমেরিকানেরা এইরূপে ফল সংরক্ষিত করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যবসায় চালাইতেছে।

পার্শিজাতির উপাস্য দেবতা।

পার্শিরা সকলেই অগ্নিপূজক, তাহা-দিগের উপাস্য দেবতা ভেদে তাহারা তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণী বিহি-রাম, দ্বিতীয় শ্রেণী অদরণ, তৃতীয় শ্রেণী দদগণ নামে অভিহিত। দদগণের পূজায় যে ব্যয় হয়, বিহিরামের পূজায় তদপেক্ষা ত্রিশগুণ ব্যয় ও আয়োজন হইয়া থাকে। বলসারের নিকটবর্ত্তী উদয়াদা গ্রামে বিহিরাম অগ্নি দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। দ্বাদশ শতাব্দ অতিবাহিত হইল, যখন পার্শিরা প্রথম ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন, সেই ঘটনা স্মরণার্থ এই অগ্নি সংরক্ষিত হয়। পুরোহিতেরা বলেন এই অগ্নি রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া পার্শিরা নির্ব্বিঘ্নে ভারতবর্ষে পৌঁছিয়াছিল। দিবারাত্রিতে পাঁচবার নিয়মিত সময়ে ইহাতে সচন্দন ইন্ধন প্রদত্ত হইয়া থাকে। হোমের স্থান মন্ত্র সমেত আহুতি প্রদান করিতে হয়। বিহিরামের অব্যবহিত নিম্নেই অদরণ অগ্নি। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে মাণিকজী লোয়েজি অনেক অর্থ ব্যয়ে বোম্বাই নগরে ইহার মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। মন্দিরটি পুরাতন হওয়াতে পূর্ণ সংস্কারের প্রয়োজন হয়। কিছুদিন হইল জলভাই আদিসিয়ার লক্ষটাকা ব্যয়ে ইহার সংস্কার কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। ইহার অগ্নি একটী প্রকাণ্ড রৌপ্যাধারে সংরক্ষিত, তাহার মূল্য প্রায় ৭০০০ টাকা। মন্দিরের যে কক্ষে ইহা প্রতিষ্ঠিত, তথায় যাজক বা তাহার সহকারি ব্যতীত কাহারও যাইবার অধিকার নাই। মন্দিরের সংস্কার সময়ে ইহা স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখনও অপর ব্যক্তির নিকটে যাইবার অনুমতি ছিল না। বংশ পরম্পরা পুরোহিতগণ কেবল ইহার যাজন ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন। জলভাই, মাণিকজীর অষ্টম পুরুষজাত। সংস্কারান্তে মন্দিরের পুনঃ প্রতিষ্ঠা দিবসে নিয়মিত পূজা হোম অন্তে পার্শিদিগের মধ্যে মহাভোজ হইয়াছিল। রজনীতে মন্দিরটী আলোক-মালায় পরিশোভিত হয়।

বিশ্বসেবাব্রতে স্ত্রীলোকের সহকারিতা।

(গত প্রকাশিতের শেষ)

রোগীর সুস্থতার জন্য চিকিৎসা ও শুশ্রূষা দুইই আবশ্যক বটে, এবং উক্ত দুই কার্য্য একের দ্বারা সুসম্পন্ন হইবারও সম্ভাবনা নাই সত্য, কিন্তু যেমন শুশ্রূষাকারিণী জ্ঞানবুদ্ধিহীন, স্নেহমমতাশূন্যা, অধৈর্য্যা ও নিন্দনীয় চরিত্রের হইলে সুচিকিৎসকেরও চিকিৎসার সমূহ ব্যাঘাত হয়—এমন কি সময় সময় তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যায়; তেমনি তুমিও অসুস্থদেহ, বিশ্বের মঙ্গলের জন্য যতই কেন প্রাণপণে চিকিৎসা কর না, তোমার সহকারিণী বিশ্বের শুশ্রূষাকারিণী যদি গুণহীনা হয়েন, তাহা হইলে তোমার কার্য্যও অত্যন্ত প্রতিবন্ধকময় ও নিতান্ত বিফল হইবে সন্দেহ নাই। তাই বলিতেছি অগ্রে সহকারিণীকে উপযুক্ত কর, তৎপরে বিমল সুখকর বিশ্বসেবাব্রতে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

এক্ষণে কথা হইতেছে কোন্ অবস্থায় স্ত্রীলোকগণ বিশ্বসেবা ব্রতের সহকারিণী হইবার বিশেষ উপযুক্তা? আমরা বলি এদেশীয় অবীরা বালিকাগণ ও সকল দেশীয় চিরকুমারীগণই বিশ্বসেবা ব্রতের প্রকৃত সহকারিণী হইবার যোগ্যা। এদেশীয় বিধবা বালিকাগণ যদি আপনারা সম্যক্ প্রকারে উপযুক্ত হইয়া বিশ্বসেবাব্রতের সহকারিণী হইতে পারেন, তাহাহইলে যে তাঁহাদের হৃদয় পুণ্যময় হইয়া এক উচ্চতর বিমল আনন্দে পরিপূরিত এবং তাঁহাদের জীবন সংসারাতীত স্বর্গীয় ভাবের জীবন্ত দৃষ্টান্তস্থল হইয়া সহস্র সহস্র সংসারাসক্ত নরনারীর প্রাণকে চমকিত, বিলোড়িত ও উদ্বোধিত করিয়া তুলিতে সক্ষম হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইঁহাদিগকে সহকারিণী করিলে—সার্থক-জন্মা বিশ্বসেবা ব্রতধারীও আশাতিরিক্ত ফল লাভ করিয়া মনোবাসনা সিদ্ধ করিতে পারিবেন।

আবার বর্ত্তমান কালের শিক্ষিতা মহিলাগণ পূর্ব্ব প্রচলিত ব্রত নিয়মাদি কুসংস্কারসংস্পৃষ্ট বোধে পরিত্যাগ করিয়াছেন, এ সময়ে যদি তাঁহারা বিশ্বসেবাব্রত অবলম্বিনী কিম্বা বিশ্বসেবা ব্রতের সহকারিণী না হইবেন, তবে তাঁহারা কি হিতানুষ্ঠান লইয়া মনুষ্যজীবন সার্থক করিবেন? মার্জ্জিতবুদ্ধি সুশিক্ষিত নর নারীর কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা কোন মন্দ বিষয় পরিত্যাগ করিয়া সেই শূন্য স্থান ভাল বিষয় দ্বারা শীঘ্র পূর্ণ করিয়া ফেলেন, নতুবা সেই শূন্যস্থান নৈসর্গিক নিয়মানুসারে অচিরে আর একপ্রকার মন্দ বিষয়ে পূর্ণ হইয়া পরিতাপের কারণ হইবে। কেবল অসত্যকে

তাড়াইলে কি হইবে, যদি না সত্যের রাজসিংহাসন চিরদিনের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পার! প্রাচীনারা আহ্নিক পূজা ও ব্রতাদি নিয়মের অনুষ্ঠানে লিপ্ত থাকিয়া কেমন সাত্ত্বিক ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন! বর্ত্তমানের শিক্ষিতা মহিলাগণ যদি ভূমা ঈশ্বরের পূজা অর্চ্চনা ও মনুষ্য জীবনের মহৎ কর্ত্তব্য বিশ্বসেবাব্রত পালন না করিয়া কেবল বিলাসিতা এবং বসন ভূষণের অভিনবতর ফ্যাসন উদ্ভাবনের প্রসঙ্গ লইয়াই জীবনের অধিকাংশ সময়টা কাটাইয়া দেন, তাহা হইলে নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় সন্দেহ নাই। মনুষ্য জীবনে হিতানুষ্ঠান নিতান্তই আবশ্যক। হিতানুষ্ঠানবিহীন জীবন কি—জলহীন নদী, ফলহীন তরু, মাতৃহীন শিশু, সন্তানহীন নারীক্রোড়ের ন্যায় শোচনীয় নহে? যথাসাধ্য বিশ্বসেবাব্রত পালন না করিলে ধর্ম্ম সাধন সম্পূর্ণ হয় না, কেবল মাত্র ঈশ্বরারাধনায় ধর্ম্মের অর্দ্ধাঙ্গমাত্র সাধিত হয়। হিতব্রতশূন্য হৃদয় সত্যশূন্য জ্ঞান, নিঃস্বার্থতাশূন্য প্রেম, কর্ম্মশূন্য দেহ, উন্নতচিন্তাশূন্য মনের ন্যায় একান্ত সৌন্দর্য্যবিহীন ও নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ও অসার্থক। তাই সানুনয়ে বলিতেছি—হে বিশ্বসেবাব্রত পথের পথিক মহাত্মগণ! নারীগণকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন না, বিশেষ পবিত্রহৃদয়া দুঃখিনী বালবিধবা ও পূতচরিত্রা নিঃস্বার্থহৃদয়া কুমারীগণকে কখনই পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন না। শ্রদ্ধাসহকারে ঐকান্তিক ইচ্ছার সহিত তাঁহাদিগকে সহকারিণী নিযুক্ত করিবেন।

বিশ্বসেবার ন্যায় শান্তি রসাস্পদ পুণ্যময় আত্মপ্রসাদজনন কার্য্য আর কি আছে? এ পৃথিবীতে নিজের জন্য চিন্তা ও পরিশ্রম সকলেই করিয়া থাকে, কিন্তু এই চিন্তা ও পরিশ্রমের ব্যাপকতানুসারে তাহারা গৌরবান্বিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ নিঃস্বার্থ ভাবে যিনি যত বেশী লোকের জন্য শারীরিক কিম্বা মানসিক শ্রম করেন, তাঁহার শ্রমের মূল্য তত অধিক। যাঁহার যতটুকু শারীরিক কিম্বা মানসিক শ্রমের ব্যাপ্তি, তাঁহার ততটুকু বিশ্বসেবাব্রত পালন করা হয়। নর নারীর মধ্যে যিনি প্রাকৃতিক জ্ঞানে ভূষিত হইয়া হৃদয়কে উচ্চতর ও প্রগাঢ়তর ঈশ্বরপ্রীতির আধার করিয়াছেন, এবং যথাসাধ্য বিশ্বসেবারূপ মহাব্রত সাধন করিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হওয়া যাঁহার স্থির সংকল্প, তিনিই ধন্য, তাঁহারই জীবন সফল, তিনিই বিমল শান্তিতে পূর্ণ হইয়া সুখে মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিবেন।

নারীগণকে বিশ্বসেবার সহকারিণী পদে নিযুক্ত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য এবং স্ত্রীলোকেরও সহকারিতা করিতে প্রস্তুত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া আমরা বিবেচনা করি, কিন্তু হে

বিশ্ব-সেবক মহাত্মাগণ! তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে উপযুক্ত না দেখিলেও পবিত্র মহৎ কার্য্যের অনধিকারিণী মনে করিবেন না। সূর্য্য প্রথমে সলিলকণা সকলকে উচ্চ বিমান পথে লইয়া যায় বলিয়াই তাহারা অসীম আকাশ ও মুক্ত বায়ুর সহযোগে সম্যক্ প্রকারে প্রশস্ততা ও নির্ম্মলতা লাভ করিয়া শেষে জড় উদ্ভিদ্ এবং প্রাণিরাজ্যের অশেষ মঙ্গল সাধনের জন্য ভূতলে অবতীর্ণ না হইয়া থাকিতে পারে না। নারীগণকে যদি না প্রথমে জ্ঞান ধর্ম্মের উচ্চ প্রদেশে লইয়া যাওয়া হয়, তাঁহারা কখনই সংকীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে আনন্দমনে বিশ্বসেবায় মনোযোগিনী হইতে পারিবেন না। কিন্তু যদি তাঁহাদিগকে প্রথমে জ্ঞানরূপ বিশালতাময় আকাশ মার্গে, ধর্ম্মনীতিরূপ সুশীতল প্রমুক্ত মারুতহিল্লোলে লইয়া যাওয়া হয়, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই হৃদয়ের নীচতা ও সংকীর্ণতা দূর করিতে পারিবেন; এবং হৃদয়ের প্রসরতা ও গভীরতা লাভ করত মনুষ্যের প্রতি নিঃস্বার্থ প্রীতি প্রণোদিত হইয়া অনায়াসেই বিশ্বসেবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিতে সমর্থ হইবেন। তখন বিশ্বজনীন প্রেমে পূতহৃদয় হইয়া বিশ্বের কল্যাণের জন্য আনন্দিত চিত্তে ধন জন মন সকলই সমর্পণ করিবেন—এমন কি আবশ্যক হইলে দুর্লভ জীবন পর্য্যন্তও অকাতরে বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। ধন্য সেই দেহ মন, ধন্য সেই ধন জন, ধন্য সেই প্রিয় জীবন, যাহা পর হিতের জন্য অকাতরে ব্যয়িত হয়!!

বাঙ্গালা প্রবচন।

(৩২৬ সংখ্যা ৩৪৩ পৃষ্ঠার পর)

ধ

১। ধন জন গৌরবের গর্ব্ব কর মন,
জাননা নিমেষে কাল করিবে হরণ।

২। ধন দিয়ে মন বুঝে,
যৌবন দিয়ে আক্কেল বুঝে।

৩। ধনে সুখ নয় কিন্তু সুখ হয় মনে।

৪। ধর কাছি ত ধরে আছি।

৫। ধরাকে সরা জ্ঞান।

৬। ধরে মাছ না ছোঁয় পানি।

৭। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।

৮। ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাগতিঃ।

৯। ধর্ম্মের কল বাতাসে চলে।

১০। ধর্ম্মের ঘরে কুটের অভাব নাই।

১১। ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়।

১২। ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজে।

১৩। ধর্ম্মের ঘরে পাপি সয় না।

১৪। ধর্ম্মের ষাঁড়।

১৫। ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং।

১৬। ধান্ ভান্‌তে শিবের গীত।

১৭। ধার ক'রে হাতী কেনা।

১৮। ধাইয়ের কাছে কোঁক ছাপা।

১৯। ধারে কাটে, আর ভারে কাটে।

২০। ধুবড়ীর ভিতর খাসা চাল।

২১। ধূলা মুটা ধর্‌তে কড়ী মুটা (বা সোণামুটা) হয়।

২২। বোবার গাধা ভাতের কাটি বয় না।

প্যানেমার খাল।

১৫১৩ খৃষ্টাব্দের ২৫এ সেপ্টেম্বর তারিখে ভাস্কো নিউনেজ ডিবল বোয়া প্রথমে প্রশান্ত সমুদ্র ভ্রমণে যাত্রা করেন। সেই সময় হইতে এই খাল কাটিবার কথা হয়। অনেকে ভাবেন ইহা একটি নূতন কথা। ডি লেসেপ্ সোএজ খাল কাটিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, প্যানেমার খাল কাটার প্রস্তাব তিনিই প্রথমে উত্থাপন করেন। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দী হইতে যখন কথা চলিতেছে, তখন কেমন করিয়াই বা প্রস্তাবটিকে নূতন বলি? আণ্টনিও গ্যালভাজ নামে পর্ত্তুগিজ নাবিক নিকারেগুয়া হ্রদ দিয়া একটি ও প্যানেমা দিয়া আর একটি খাল কাটিবার কথা তুলেন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে স্পেনরাজ তৃতীয় চার্লস যোজক দেখিয়া মন্তব্য প্রকাশার্থে ম্যানুএল গ্যালিসট্রো নামক কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে কতিপয় পোতসহ প্রেরণ করেন। এই উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্যারণ হমবোল্ট স্থানটি পরিদর্শন করিয়া খাল কাটার ব্যাপারটি সাধ্যায়ত্ত বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। ১৮২৬ সালে আমেরিকার যুক্তরাজ্যই এ বিষয় প্রথমে যত্ন ও মনোযোগ পূর্ব্বক বিবেচনা করেন। সে যাহাহউক এখন বিবেচিতব্য, কোন্ ব্যক্তি কার্য্যতঃ প্যানেমার খাল কাটিবার প্রথম উদ্‌যোগ করেন? ইনি সম্ভবতঃ ফরাসী নাবিক লেপ্‌টেনেণ্ট লুসিয়ান নেপোলিয়ন্ বোনাপার্ট ওয়াইজ। ইনি যোজক দর্শনপূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া মুসে কাডিস্তালড ডি লেসেপের সহিত যোগদান করিয়া এক কোম্পানী সংগঠন করেন। খালে বিশেষ উপকার হইবে বলিয়া তাঁহার মত লোক এমত দুরূহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। নানা প্রকার প্রতিবন্ধক হইতেছে, লোকে এমন কি হাস্য পরিহাসও করিতেছেন, কিন্তু লেসেপের প্রতিজ্ঞা কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হইবার নয়; প্রত্যুত বাধা পাইয়া ইহা উত্তরোত্তর আরও প্রোৎসাহিত হইতেছে। খাল কাটা সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত

প্রতিবন্ধক গুলি উপলব্ধি করিতে হইতেছে ;—(১) বর্ষাকালে বন্যা ; (২) বড় বড় দুর্ভেদ্য শিলাময় শৈলরাজি ; (৩) যোজকের জলবায়ুর অপকারিতা ; (৪) সমুদ্রসমতলের পার্থক্য। সাড়ে একুশ (২১½) ক্রোশ কাটিতে হইবে, তাহাতে আবার এই সকল প্রতিবন্ধক। মে হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এখানে ভয়ানক বৃষ্টি হইতে থাকে। গড়ে বৎসরে ১১৯ ইঞ্চ বৃষ্টি পড়ে। স্থানটি অতিশয় অস্বাস্থ্যকর, এখানে যাহারা কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, তাহাদিগের মধ্যে চীন বেশী, য়ুরোপীয় তদপেক্ষা কম, সর্ব্বাপেক্ষা কম নিগ্রো। হাঁসপাতাল সংস্থাপিত হইয়াছে, তথাপি পীড়ার বিশেষতঃ ছায়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব কমে নাই। কতদূর কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছে তদ্বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র আভাস পাঠক পাঠিকাবর্গকে জ্ঞাত করিতে হইলে সংক্ষেপে বোধ হয় এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এ পর্য্যন্ত ১৮০ ভাগের একভাগ মাত্র কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং তুলনা করিয়া বলিতে হইলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, কার্য্য কিছুই হয় নাই। কিন্তু লেসেপের প্রতিজ্ঞা পরাভূত হইবার নয়, তিনি যে কার্য্যে হাত দিয়াছেন, তাহা সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। একার্য্য যে তাঁহা-দ্বারা সংসাধিত হইবে, ইহাতে আমাদের বিশ্বাস আছে।

কুরুক্ষেত্র পর্য্যটন।

(৩২৫ সংখ্যা ৩১০ পৃষ্ঠার পর)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে রামহ্রদ অতি প্রাচীন তীর্থ। সত্যযুগে ইহাকে ব্রহ্মসর বলা হইত। ভগবান্ পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া যখন কৃত কর্ম্মের আলোচনা করিতে লাগিলেন, তখন আপনাকে নরঘাতী ভীষণ পাপাত্মা জানিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন। কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য ব্যবস্থাপ্রার্থী হইলে তাঁহাকে ব্রহ্মসরে স্নান করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইল। তিনি তদনুসারে এই সরে স্নান করিয়া নরহত্যাদি মহাপাতক হইতে মুক্তি পান। তিনি, পাপ ভার স্খলিত হইলে, মত্তানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় নামে সরের নাম পরিবর্ত্তিত করিলেন। তদবধিই ইহাকে রামহ্রদ বলা হইয়া থাকে। এখানে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ ধৌত হয়, বিশেষতঃ মধ্যাহ্ন স্নানের মাহাত্ম্য পুরাণে গণনা করিয়া শেষ করিতে পারেন নাই—অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় ও সশরীরে স্বর্গ লাভ। আমাদের ভাগ্যে শেষোক্তটী ঘটে নাই, বোধ হয় কিছু অধিকক্ষণ থাকিলে জলের

গুণে ও কশ্যপের অনুগ্রহে সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা ছিল। তবে দারুণ আষাঢ় শ্রাবণ মাসের বেলা দ্বিপ্রহরে পঞ্জাবের প্রচণ্ড রৌদ্রে কুরুক্ষেত্র মহাপ্রান্তরে যে ভ্রমণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তাহা নিশ্চয়ই প্রথমটীর ফলে স্বীকার করিতে হইবে। ব্রহ্মসর, রামহ্রদ ব্যতীত ইহার আরও দশটী নাম আছে। তাহাদিগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন এ স্থলে অনাবশ্যক বোধে উপেক্ষিত হইল। হ্রদের বা কুণ্ডের এক কোণে নানকপন্থীদিগের একটী মঠ আছে। গুরুগোবিন্দের শিষ্য গোঁড়া আর্ঠেলা পঞ্জাবে প্রধান প্রধান হিন্দুতীর্থের নিকট আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া সদুপদেশ দ্বারা প্রমাদী নর নারীদিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। বৃন্দাবন ও মথুরার ন্যায় এখানেও কচ্ছপের যেমন, সেইরূপ বানরেরও উপদ্রব অল্প নহে। আমাদিগকে বস্ত্র ও উপানৎ বহু সতর্কে রক্ষা করিতে হইয়াছিল। স্নানাদি সমাপন করিয়া নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। নিকটেই সেখ জিল্লির মোকবরা। হিন্দু তীর্থের নিকট মুসলমানের মসজিদ সংক্রামক।

থানেশ্বর ইতিপূর্ব্বে একটী জনপূর্ণ মহানগর ছিল। এখানে প্রায় ৩০ সহস্র লোকের বসতি ছিল। সুবৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখিলে ইহার অতীত গৌরবের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এক্ষণে ছয় সহস্র লোকের অধিক বসতি নাই। অনেক বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা লোক ও সংস্কারাভাবে পতিতপ্রায়। স্থানে স্থানে প্রশস্ত রাজপথ ও সুন্দর সুন্দর উদ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে এখানে সরকারী কার্য্যালয় সকল থাকাতে কতকটা জনপূর্ণ ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহা স্থানান্তরিত হওয়াতে লোক সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে—প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান বলিয়াই এখনও জনশূন্য হয় নাই। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল ও শূরসেনকে ব্রহ্মর্ষি দেশ বলে। ইহা যজ্ঞীয় দেশের অন্তর্গত। আদিম আর্য্য জাতি প্রথমেই এই স্থানকে বসতির উপযুক্ত বোধে মনোনীত করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত আর্য্যাবর্ত্ত, মধ্যদেশ ও ব্রহ্মাবর্ত্তও তাঁহাদিগের বাসস্থান ছিল, সুতরাং এই সকল দেশ কেবল যজ্ঞীয় দেশ নামে অভিহিত হইত। যজ্ঞীয় দেশের প্রধান লক্ষণ-যথায় যজ্ঞের উপযোগী কৃষ্ণসার মৃগ সকল বিচরণ করে। ইহার বহির্ভাগস্থ সমস্ত দেশই ম্লেচ্ছ দেশ। এক্ষণে সেই যাগযজ্ঞপরায়ণ আর্য্যজাতি নাই, যজ্ঞীয় দেশও নাই। ভারতের সর্ব্বত্রই ম্লেচ্ছসংশ্লিষ্ট ম্লেচ্ছ দেশ।

নগরের দুরবস্থা দর্শন করিতে করিতে ক্রমে আমাদের রথ পাণ্ডবের নিকেতনে আসিয়া পৌঁছিল। তখন বেলা প্রায় ১টা। পূর্ব্ব বন্দোবস্ত অনুসারে অন্ন প্রস্তুত ছিল, সুতরাং পরিতোষপূর্ব্বক আহার

সম্পন্ন হইল। সমভিব্যাহারী বন্ধুদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্রামার্থ শয্যাশায়ী হইলেন। একে একার ধাক্কা, তাহাতে পঞ্জাবের মধ্যাহ্ন রৌদ্র ও অসময়ে আহার, সুতরাং শরীর অবসন্ন হইয়া শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু আমি এই রৌদ্রোপভোগে ও একারোহণে তৃপ্ত হইতে পারি নাই, সুতরাং বিশ্রাম ভোগে বিরত হইলাম। শীঘ্রই অন্যরথে (কারণ আমাদিগের পূর্ব্বরথের অশ্বসকল আমার মত ভ্রমণ-প্রিয় ছিল না, তাহারা ক্ষণিক রৌদ্রোপ-ভোগ করিয়াই অবসন্ন হইয়া পড়িয়া-ছিল) আরোহণ করিয়া পথ প্রদর্শকের সহিত পুনর্ব্বার ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। পূর্ব্বাহ্ণে রথারোহণ ও রৌদ্রসেবন সুখ অল্পই ভোগ করিয়াছিলাম, কিন্তু এবার আর সে আক্ষেপ রহিল না। আজি শ্রাবণ মাসের দক্ষিণায়ন সংক্রান্তির পূর্ব্ব-দিন। প্রদীপ্ত নভোমণ্ডল মেঘস্পর্শ-শূন্য। মার্ত্তণ্ড দেব অগ্নি বিকীর্ণ করিতে করিতে বিষুব রেখা অতিক্রম করিতে-ছেন। উত্তপ্ত বায়ুরাশি বাষ্পাকারে উদ্ধোত্থিত হইতেছে। রাজপথে লোকের গমনাগমন বিরল হইলেও ধূলিরাশির প্রাদুর্ভাব অল্প ছিল না। একে একার কষ্টদায়ী ব্যায়াম ও রৌদ্রে অর্দ্ধদগ্ধ গলদঘর্ম্ম বপু, তাহাতে অগ্নিকণানিভ ধূলিরাশি-হরিদ্রাঞ্জন যোগ। ক্রমে নগর অতিক্রম করিয়া দ্বৈপায়ন হ্রদকূলে উপস্থিত হইলাম। বলা বাহুল্য যে হ্রদের এই প্রদেশ কেবল জলশূন্য নহে, প্রচণ্ড রৌদ্রে তদ্দেশ সম্যক বিদীর্ণ হইয়া অগ্নকুণ্ডাকার ধারণ করিয়াছে। স্থানে স্থানে ঘাট বান্ধা আছে বটে, কিন্তু তাহা বৃক্ষ ও ছায়াভাবে পথিকের দ্বিগুণ যন্ত্রণার কারণ হইয়াছে। শুধু মৃত্তিকার উত্তাপেই রক্ষা নাই, তাহার উপর ইষ্টক ও পাষাণ উত্তপ্ত হইলে যে কি কষ্টকর, তাহা ভুক্তভোগী লোকেই বিল-ক্ষণ বুঝিতে পারে। অশ্বদ্বয়ও উত্তপ্ত বালুকায় বৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতেছিল। ক্রমে হ্রদের দুই দিক্ প্রদক্ষিণ করিয়া আমরা সিদ্ধবটীতে উপস্থিত হইলাম। প্রচণ্ড রৌদ্রের পর বটচ্ছায়া যে কি তৃপ্তিকর, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা করে না। সিদ্ধবটী সমুচ্চ হ্রদকূলে প্রতিষ্ঠিত, শাখা প্রশাখা ও ঝুরি বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া তলস্থ মঠের আচ্ছ-পত্র স্বরূপ বিরাজ করিতেছে। কিয়ৎক্ষণ ছায়াতলে বিশ্রাম করিয়া শ্রান্তিদূর করিলাম। যে বায়ু প্রান্তরে ও ছায়ার বহির্ভাগে অনল হল্কা বহন করিতে-ছিল, তাহা যে কিরূপে এখানে শৈত্যগুণ প্রাপ্ত হইল ভাবিয়া স্থির করিতে পারি-লাম না। পিপাসায়ও শুষ্কতালু হইয়া-ছিলাম, মঠের বহির্ভাগস্থ কূপ হইতে জল তুলিয়া আচমনাদি করিলাম। কূপোদক, সুতরাং শীতল, কিন্তু বিস্বাদ হেতু পান করিতে পারিলাম না; তথাপি আচমনেই পিপাসা দূর হইল। বটতলাটি পরি-ষ্কার ও পবিত্র, নানা জাতীয় পক্ষী

শাখাশ্রয় করিয়া সুখে কলকাকলি করিতেছে। শাখামৃগেরও অভাব ছিল না। স্থানটী নয়ন বলিয়া সমস্ত বৈপায়ন হ্রদ ও নগরের ভিন্নাংশ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। নগর এখান হইতে অনধিক এক ক্রোশ হইবে। মঠস্থ দর্শনীয় পদার্থ সকল (যাহা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে) দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার অশ্বোপরি উপবিষ্ট হইলাম। এবারে আমরা বনপথে ধাবিত হইলাম, এখন পথ ছায়াময়।

পৃথিবীর ছাদ।

এই অপূর্ব্ব নাম শুনিয়া অনেকে অনেক প্রকার কল্পনা করিতে পারেন। কবি নক্ষত্রখচিত সুনীল চন্দ্রাতপশোভিত নভোমণ্ডলকে, বৈজ্ঞানিক নিগর বায়ুমণ্ডলকে এবং স্থূলদর্শী শূন্যকেই ছাদরূপে গ্রহণ করিবেন। কোন কোন প্রখর স্মৃতিশক্তি-বিশিষ্টা পাঠিকা পিতামহীর উপকথা-বর্ণিত "বুড়ির সম্মার্জ্জনী-তাড়িত আকাশ" কেও পৃথিবীর ছাদ বলিতে পারেন। কিন্তু আমাদিগের অভ্যাবিত ছাদ ইহার একটীও নহে। ইহা প্রকৃত পৃথিবীর ছাদ কিনা তাহা একজন প্রসিদ্ধ পর্য্যটকের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে আমরা যাহা সংগ্রহ করিয়া প্রকটিত করিলাম, তাহা পাঠ করিলেই বোধগম্য হইবে।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে পর্য্যটক কাশ্মীর হইয়া উত্তর খণ্ডে গমন করেন। কিছুদিন ইয়র্কখণ্ডে অবস্থান পূর্ব্বক পামির প্রদেশ প্রদক্ষিণ করিতে কৃতসংকল্প হন। তিনি বলেন যে "কাশগেরিয়ার সমতলক্ষেত্র উত্তীর্ণ হইলেই একটী অপূর্ব্ব স্থান দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তত্রত্য লোকেরা ইহাকে বামই দুনিয়া বা পৃথিবীর ছাদ বলিয়া থাকে। "পামির পার্ব্বতীয় প্রদেশ, সমতলক্ষেত্র হইতে সহসা উর্দ্ধোত্থিত হইয়াছে। মূলদেশ সিন্ধুসমতল হইতে ৪০০০ পাদ উচ্চ এবং শৃঙ্গ সকল ২৫।২৬ হাজার পাদ গগনভেদ করিয়া উঠিয়াছে। মূলদেশ হইতে শীর্ষ পর্য্যন্ত শুভ্র তুষারাবরণে চির আবৃত। উপত্যকা ও অধিত্যকা হিমশিলার নিত্য লীলাস্থলী। চতুর্দ্দিকে উন্নত নগমালা প্রাকারের ন্যায় স্থাপিত, উপরে অনন্ত নিহাররাশি ছাদ রূপে উত্তরোত্তর উত্থিত হইতেছে এবং চূড়াকারে শৃঙ্গ সকল অম্বরে বিলীন হইতেছে।" পর্য্যটক "বামই-দুনিয়াকে এতদবস্থ দেখিয়া" "পৃথিবীর ছাদ" না বলিয়া "পৃথিবীর দ্বিতলগৃহ" বলিতে চান। তুরাণীয় গৃহ সকলের ছাদ আমাদের ইষ্টকালয়ের ছাদের ন্যায় সমতল। বাসিন্দারা বাহির হইতে প্রাচীরের উপর উঠিয়া তদুপরি উপ-

বেশন ও আরামাদি করিয়া থাকে। এই ছাদ এক প্রকার বৈঠকখানারও কার্য্য করে। তাঁহার মতে এই পর্ব্বত অঞ্চলেরও এই "পামির" বা ছাদ নামকরণ হইয়াছে। একবার পার্ব্বতীয় পথানুসরণ করিয়া অধিত্যকায় উঠিতে পারিলেই এই ভাব হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। নিম্নে সমতল ভূমি, অনুচ্চ নগরাজী ও প্রকাণ্ড উপত্যকা—তথা হইতে শৃঙ্গ সকল স্তম্ভাকারে উত্থিত হইয়াছে। হিমালয়ের ও হিন্দুকুশের উপত্যকাসকল যেমন গভীর, অপ্রশস্ত ও বদ্ধ, এখানে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। অনবরত শিলাপাতে খাদ সকল সর্ব্বদা পরিপূর্ণ, তদুপরি আবার হিমশিলার প্রাদুর্ভাব। যে পরিমাণে বৃষ্টিধারা-বেগে তুষার সকল প্রবাহিত হইতেছে, তাহার দ্বিগুণ পরিমাণে হিমশিলা জমিয়া যাইতেছে। এই সকল উপত্যকাই পামির নামে প্রসিদ্ধ। তত্রত্য অধিবাসীরা উপত্যকা বিশেষকেও পাইমর নামে অভিহিত করিয়া থাকে। এখানকার এক একটী উপত্যকার তলদেশ দুই তিন ক্রোশ বিস্তৃত ও প্রায় সমতল ক্ষেত্র, কিন্তু সিন্ধুর সমতল হইতে অনেক উচ্চ। তাগ-দুম-বাস পামির ১০৩০০ হইতে ১৫০০০ পাদেরও অধিক উচ্চ। অন্য অন্য পামির ১২০০০ হইতে১৪০০০ পাদ উচ্চ। পর্য্যটক বলেন এই সকল পামির উপত্যকার সর্ব্ব নিম্ন স্থান ইয়ুরোপের আল্‌পস পর্ব্বতের উচ্চতম শিখরের সমান। বড় পামির, ছোট-পামির, আলিচর পামির প্রভৃতি আরও কয়েকটী পামির আছে। সকল স্থানেই তুষার ও হিমশিলার রাজত্ব। ছোট পামিরের কোন কোন স্থান গ্রীষ্ম কালে তুষারশূন্য হয় বটে, কিন্তু বড় পামিরের সহিত যেখানে সংযুক্ত, তথায় চিরনিহার বিরাজমান। এখানে প্রাচীন হিমশিলারও ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। তুষার নগরাজী ছায়ার ন্যায় রূপান্তরিত হইয়া ক্রমে বিলীন হইতেছে, কোন কোনটী স্থূল শুভ্র প্রস্তরময় প্রতীয়মান হইলেও মুহূর্ত্তে বাষ্পাবৃত হইয়া মেঘের ন্যায় আকার সকল প্রদর্শন করিতে করিতে ক্রমে অদৃশ্য হইতেছে, কিন্তু অধিকাংশ শিলাপিণ্ড জমিয়া পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত নির্ম্মাণ করিতেছে। পর্য্যটক এই স্থানে আর একটী চমৎকার দৃশ্য অবলোকন করিয়াছেন। এক-কেই তাল উপত্যকার নিকট রাং-কুল নামে একটী হ্রদ আছে। এই হ্রদের উপকূলেই একটী সমুচ্চ নগ অধিষ্ঠিত। এই নগ মধ্যে একটী প্রকাণ্ড গুহা বিদ্যমান্। এই গুহার উপরিভাগ চির-আলোকে সমুজ্জ্বল। তত্রত্য বাসীন্দারা ইহাকে "চেরাগ-তাস" অর্থাৎ "প্রদীপ" বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস যে গুহাভ্যন্তরে এক পক্ষ বিশিষ্ট মহাসর্প (Dragon) বাস করে, তাহারই নেত্রজ্যোতি দ্বারা গুহা

এরূপ আলোকিত। ভয়ে কেহই গুহার সন্নিকটে গমন করে না। নিম্নস্থান হইতে এই আলোক স্পষ্ট দৃষ্ট হয়, বোধ হয় যেন কোন তাপহীন জ্যোতিষ্মান্ বস্তু হইতে আলোক নিঃসৃত হইতেছে। রহস্য ভেদে কৃতসংকল্প হইয়া পর্য্যটক অকুতোভয়ে গুহা সন্নিধানে গমন করিলেন। স্থানটী সমুচ্চ ও দুর্গম, সুতরাং গমনে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। উপানৎ খুলিয়া হামাগুড়ি দিয়া বিড়ালের ন্যায় কষ্টে স্মৃষ্টে তথায় উঠিয়াছিলেন। নিকটে যাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। আলোক মহাসর্পের নেত্রজ্যোতি বা জ্যোতিষ্মান্ বস্তুজাত নহে, কিন্তু সাধারণ ভোগ্য দিবাকর সূর্য্য দেবের কিরণ-জাত আলোক। গুহাটী নগের অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং সুড়ঙ্গাকারে গঠিত। প্রকাণ্ড ছিদ্রের ন্যায় ইহার উভয় দিক্ হইতে আলোক দেখা যায়। পর্ব্বতের নিম্নদেশ হইতে সুড়ঙ্গটী দেখা যায় না, কেবল গুহাটীর উপরিভাগ মাত্র দৃষ্ট হয়। গুহার উপরিভাগে এক প্রকার চূর্ণ-নিভ পদার্থে আবৃত, তদুপরি সূর্য্যবিম্ব প্রতিফলিত হইয়া এই অপূর্ব্ব আলোক উৎপন্ন করে। পর্য্যটক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া বাসিন্দাদিগের ভ্রম ভঞ্জনার্থ ইহা ব্যক্ত করিলে কেহই তাঁহার বাক্যে প্রত্যয় করিল না। মহাসর্পের নেত্রজ্যোতির কথা তাহারা পুরুষানুক্রমে শুনিয়া আসিতেছে, সুতরাং তাহাই তাহাদিগের সংস্কার। রাংকুলের জল নীলবর্ণ এবং দেখিতে অতি সুন্দর, কিন্তু এমন লবণাক্ত যে পান করিবার যো নাই।

সুনীতি ও ধ্রুবের কথোপকথন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সু। আমার হারানিধি বুকজুড়ানো ধন কোথায়? এই যে—একবার কোলে আয় বাপ—তোর ওই চাঁদমুখখানি দেখে আমি সকল দুঃখ ভুলে যাই, তাপিত প্রাণ শীতল করি! দেবদুর্লভ হরিধনে ধনী হয়ে ঘরে ফিরে আস্‌বে, সেই আশায় এতদিন জীবিত রয়েছি, নতুবা তোর অদর্শনে প্রাণবায়ু কবে দেহ হইতে বহির্গত হত। ভাল ধ্রুব—বলি তুমি কি পেয়েছ—দুঃখিনী মায়ের জন্যে কি এনেছ—একবার দেখাও দেখি?

ধ্রু। জননীগো প্রণাম হই—হরি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন! আমি এক মনে—এক প্রাণে তাঁকে ডেকেছি। ডাক্‌তে ডাক্‌তে গলা ভেঙ্গে গিয়েছে, তবু ডাক্‌তে ছাড়িনি। গভীর গহনে একাকী বসে অনাহারে ও অনিদ্রায় দিন যামিনী অতিবাহিত করেছি—কেমন

করে সেদিন কেটে গেছে তা টের পাইনি —তিনি কি আর সহজে আমায় দেখা দিয়াছেন! কিন্তু মা,—তোমায় কি বলব—আমার সকল কষ্ট দূর হয়েছে—সেই ভুবনমোহন রূপ দেখে আমি একেবারে মোহিত হয়ে গেছি—আহা! কি অপরূপ রূপ!—ওরূপ দেখ্‌লে আর ইচ্ছা হয় না যে চোখ ফিরাই—একবার দেখ যদি।

সু। বাপ তোর কথা শুনে, মনটা যে কেমন হয়ে গেল! বড় সাধ মনে—তোর হরিকে দেখি। তিনি কি আর এ দুঃখিনীরে দেখা দিবেন?

ধ্রু। মা আমি তারও উপায় করে এসেছি। আমি তাঁকে বল্লুম—হরি—আমার মা যখন আমায় জিজ্ঞাস্ করবেন—বাপরে তোর দুঃখিনী মায়ের জন্যে কি এনেছিস্—তখন আমি তাঁরে কি উত্তর দিব? হরি! তোমার ও ভুবনমোহন রূপ আমার দুঃখিনী মা'কেও দেখাতে হবে—তিনি বল্লেন সেকি কখন হ'তে পারে? আমারে যে ডাকে, সে পায়—ভক্ত বিনা আমি আর কাহাকেও দেখা দিই না—আমি ভক্তের চির অনুগত।

সু। সে ত ঠিক্ কথা—আমি ত আর তাঁকে না খেয়ে না ঘুমিয়ে ডাকিনি! আমায় কেন তিনি দেখা দিবেন? তিনি ভক্তবৎসল, তাই ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন! আমি অসাধনে কেমন করে সেই দেব-আরাধ্য ও যোগী ঋষির সাধনের ধন হরিকে দেখ্‌তে পাব?

ধ্রু। আমি কি আর তাঁকে অমনি ছেড়ে দিয়েছি, তিনি তোমাকে নিশ্চয় দেখা দিবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছেন—ফাঁকি দিবার যো নাই—তুমি এস না—আমি এখনি দেখাচ্ছি। ঐ যে হরি দাঁড়িয়ে আছেন, ওগো আমার দুঃখিনী মাকে দেখা দেও—তিনি তোমার জন্যে প্রতীক্ষা করে আছেন।

সু। বাপ ধ্রুবরে—তোরে গর্ভে ধরে সুনীতির জীবন আজ ধন্য হ'ল। আমি বাস্তবিকই রত্নগর্ভা—এমন রতন গর্ভে ধরেছি বলেই না আজ হরির দর্শন পেলুম। হরিহে তোমার লীলা খেলা কে বুঝ্‌তে পারে? সাধে কি ভক্তেরা তোমাকে লীলাময় হরি বলে, সম্বোধন করেন? দুধপোষা শিশুকে তুমি ধ্রুব লোকের অধিকারী করবে কে মনে করেছিল? আহা! বালকের মুখে হরিনাম কত মধুর! বাপ ধ্রুবরে—তোর ওই চাঁদমুখে একবার হরিনাম শুনা দেখি?

ধ্রু। এমন মধুর নাম লইতে রসনা
অলসে থেকনা আর—বল অবিরাম,
প্রাণারাম হেন আর কি আছে বলনা?
হরিনাম সাধনেতে হও সিদ্ধকাম।
হরিভক্ত হরিময় দেখে এ সংসার।
হরিধ্যানে হরিজ্ঞানে শয়নে স্বপনে
হরি সার—হরি তাঁর আহারে বিহারে,
হরিনাম জপমালা জীবনে মরণে।
হরিদাস চাহেনা সে তুচ্ছ রাজ্য ধন,
অসার অনিত্য সুখে সদা বীতরাগ,

যাগ যজ্ঞে মন্ত্র তন্ত্রে নাহি রয় মন,
কেবল নামেতে রুচি—শুদ্ধ অনুরাগ।
হরিগুণ গানে মত্ত—ভাবেতে বিহ্বল।
অবিরল ঝরে তাঁর প্রেমাশ্রু নয়নে,
নামামৃত পান করি প্রেমে ঢল ঢল।
কি এক স্বর্গীয় জ্যোতি বিকাশে বদনে
মর্ত্ত্যে থাকি ভক্ত করে স্বর্গ সুখ ভোগ
ভাবযোগে হৃদয়েতে সদা ভাবোদয়,
ভক্ত বিনা কার ভাগ্যে এমন সুযোগ
ঘটে বল, শুভাদৃষ্ট সহজে কি হয়?

পরীক্ষা পাঠান হরি ভক্তের কারণ,
পরীক্ষাতে পড়িলেই ব্যাকুলতা আসে,
(তাই) ভক্তের আধারে ভক্ত করে অন্বেষণ,
পাগল হইয়ে ছুটে পাইবার আশে।
অটল বিশ্বাস হেরি হরি দয়াময়—
নারেন থাকিতে স্থির,—টলে সিংহাসন,
আরম্ভ করেন এসে ভক্তের হৃদয়,
উৎসারিত হয় তাঁর ভক্তি প্রস্রবণ।

শ্রীচন্দ্রনাথ দাস।

নূতন সংবাদ।

১। দুর্ভিক্ষের প্রকোপ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে—মান্দ্রাজ, রাজপুতানা ও ব্রহ্মদেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বোধ হয়, বোম্বাই, মহীশূর, কুর্গ এবং বঙ্গদেশেও হাহাকার উঠিয়াছে। রিলিফ কার্য্যে নানাস্থানে ১লক্ষ, ৪২ হাজার ৮৮৩ জনকে খাটান হইতেছে এবং ৮৩৪১ জনকে দাতব্য সাহায্য দেওয়া হইতেছে। ভবিষ্যতে কি হয়, অত্যন্ত আশঙ্কার বিষয়।

২। বরাহনগর মিউনিসিপালিটীর সহকারী সভাপতি বাবু বিনোদলাল ঘোষ বরাহনগরে একটী স্ত্রী হাঁসপাতাল নির্ম্মাণার্থ গবর্ণমেন্টের হস্তে ১০,০০০ টাকা দিয়াছেন ও এক বিঘা ভূমির মূল্য দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। মুক্তাগাছার শ্রীমতী বিদ্যাময়ী দেবী নিজনামে স্থানীয় হাঁসপাতালে এক (ওয়ার্ড) কক্ষ নির্ম্মাণার্থ ৪০০০ টাকা দিয়াছেন। গবর্ণমেন্ট উভয় দান গ্রহণ করিয়া দাতা ও দাত্রীকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

৩। পামীর ভ্রমণকারী কাপ্তেন ইয়ং হজ্‌বাণ্ড কাশ্মীরের সহকারী রেসিডেণ্ট হইয়াছেন। ইনি ইংরাজ ও রুষ সীমান্ত অনেক স্থল পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন।

৪। ফরাসী ভাষায় বাবু কেশবচন্দ্র সেনের একখানি সুন্দর জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার লেখক চার্লস বাইসী।

৫। যুবরাজের দ্বিতীয় পুত্র প্রিন্স জর্জ এখন ইংলণ্ডের ভাবী রাজ্যেশ্বর। তাঁহার বার্ষিক বৃত্তি বাড়াইয়া ১৫০০০ পাউণ্ড করা হইয়াছে।

পুস্তকাদিসমালোচনা।

১। সাধনা—এই নামে একখানি নূতন মাসিক পত্রিকার কয়েক খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত বাবু সুধীন্দ্র নাথ ঠাকুর ইহার সম্পাদক। পত্রিকা খানিতে বিবিধ সুপাঠ্য হিতকর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে। ইহার দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি।

২। নব-সীমন্তিনী—শ্রীবসন্ত কুমারী নাথ প্রণীত, আগামী বারে সমালোচ্য।

১২৯৮ সালের বামাবোধিনীর বিষয়ানুসারে সূচিপত্র।

১। বামাবোধিনী ও স্ত্রীজাতি।

২। নারীচরিত ও স্ত্রীজাতির সংকীর্ত্তি।

৩। নীতি ও ধর্ম্ম।

৪। ইতিহাস ও দেশভ্রমণ।

৫। বিজ্ঞান।

৬। আশ্চর্য্য বিবরণ।

৭। পদ্য।

৭। বিবিধ

৮। বামারচনা।

৯। সাময়িক প্রসঙ্গ।

১০। পুস্তকাদি সমালোচনা।

১১। নূতন সংবাদ।

বামারচনা।

আমি যাব না।

ডেকনা ডেকনা আর আমি ঘরে যা'বনা
শ্মশানের নামে আর ভয়াকুলা হ'বনা;
যতদিন প্রাণ আছে,এই শ্মশানের মাঝে
বসিয়া করিব আমি ইষ্টদেবে সাধনা,
কি হইবে ঘরে গিয়া কেহ মোরে চায়না--
স্নেহ, ভক্তি, যত্ন আমি দিলে কেহ লয়না,
আমার প্রতিও কারো স্নেহস্রোত ব'য়না।
ঘরেতে রয়েছে যারা স্বার্থভরে মাতোয়ারা
মম সত্ত স্নেহ ভক্তি চরণে দলিতে চায়,
বিশ্বাসের মাথা তারা আগে চিবাইয়া খায়,
আশা ও নিরাশা দুটী ঘরের দ্বারেতে বাঁধ
দেখিলেই তাহাদের মোর চোকে লাগেধাঁধাঁ।
ঘরের প্রাঙ্গণে যাই, তিলেক দাঁড়াতে চাই.
অমনি আসিয়া স্বার্থ কট মট চোকে চায়,
আসক্তি সত্বর এসে শৃঙ্খল বাঁধয়ে পায়।
কোথা থেকে পাপগুলা ধেয়েএসে সর্প পারা
ঘিরে ফেলে মারে ছোঁ প্রাণেহই আধ মরা।
ক্রোধ,দ্বেষ হিংসাগুলি,বুকেতেমারয়েগুলি.
থাক্ সব অট্টালিকা অমরাকে দিক লাজ,
আমার সেথানে যেয়ে কিছুমাত্র নাইকাজ।
দেবেনা নেবেনা যারা, শুধু তাহাদের তরে
একটা আপদ লয়ে কেনবা রহিব ঘরে?
ডাকিওনা ওসংসার! ঘরে না যাইব আর,
এখানে থাকিব ভাল বেশ বেশ এ শ্মশান;
এখানেই মৃত্যুঞ্জয়ী শিবের সমাধিস্থান,
এই খানে মানুষের স্নেহ,-ভক্তি ভালবাসা,
পরাণের সুখ, সাধ মিটে যায় সব আশা।
গম্ভীর মূরতি ধরি বৈরাগ্যকে কোলে করি
এখানে প্রকৃতি দেবী করিছেন অবস্থান,
থাকিব এখানে আমি ভাল,ভাল এই স্থান।
এখানে থাকিব আমি শুনিব সিন্ধুগামিনী
তটিনীর কুল, কুল্, কুল, কুল-সুসঙ্গীত
আমিও ধরিব তান সেই নদীর সহিত,
আমিও তাহার সহ জীবন সঙ্গীত গা'ব,
আমিও তাহার মত মৃত্যু-সিন্ধু পানে ধা'ব।
তাহার হৃদয় পরে ধরিবে সে শশধরে,
আমার হৃদয় পরে ইষ্টদেবে ধ'রে মম
নাচাইব নদীনক্ষে তরঙ্গের শশি সম,
আমিও উহার মত জোছনা মাখিয়া গা'য়
স্বন স্বনে প্রভঞ্জন শুনিব কি বয়ে যায়।
সুন্দরী বেতসলতা, নোয়ায়ে মস্তক তথা,
কালের কৌটিল্য কথা কহিবে নদীর সনে,
শুনিব সেসব আমি একাকিনী একমনে।
নিশার শিশির বিন্দু পড়িবে মস্তকে মোর,
ভাঙ্গিয়া যাইবে তার আশার নেশার ঘোর।
সুখ দুঃখ মানামান সকলে সমান জ্ঞান
হইবে এখানে ভয়ে পলাইবে অহঙ্কার,
ডেকনা আমারে আমি ঘরে যাইবনা আর,
ক্ষুধা হলে আহার করিব বন্য বৃক্ষ ফল
তৃষ্ণায় করিব পান তটিনীর স্রোতোজল,
মাথা রেখে বাহুপরে রহিব শয়ন করে,
সর্প, শিবা, ব্যাঘ্র আদি ভূত ও পেত্নীগণ
হইবে তাহারা মম সঙ্গী আর পরিজন।
আদরে ডাকিয়া মোরে সঙ্গে লয়ে যাইবে।
ঘরে গিয়া পরে বুঝি গলা চেপে মারিবে?
না না না তাহবে না তুমি আর ডাকিও না
গৃহে বাঁধা দেহক্ষারে শ্মশানের হরিবোল,
শ্মশানে থাকিলে নাহি পরাণে বাধাবে গোল
এখানে করিব আমি ইষ্ট দেবে সাধনা,
না না না ওসংসার! ঘরে আমি যাবনা।

শ্রীকুমুদিনী রায়।